TrainTrackers এর একটি প্রয়াস

# রেল ক্যানভাস

বৈশাখ ১৪৩০

## এক ডজন গল্প

বারোটি ভিন্ন স্বাদের গল্পের সমাহার

# সম্পাদকের কলম থেকে...

১৭০ বছরের দীর্ঘ যাত্রায় ভারতীয় রেল, নানা মত নানা পথ অতিক্রম করে, ক্রমেই এক মহীরূহ হয়ে উঠেছে। আসমুদ্র-হিমাচলকে এক সূত্রে বেঁধে ১৩০ কোটি জন-জাতির একটি গোটা দেশের ভার নিজ কাঁধে বহন করে সে এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে। ছোট-বড় নানান স্বাধীন রাজ্যের মহারাজাদের তৈরি করা দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন রেল লাইনগুলি ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে ক্রমে একত্রিত হয়ে গড়ে ওঠে আজকের ভারতীয় রেল। বড়-ছোট, বাচ্চা-বুড়ো, মহিলা-পুরুষ প্রতিটা মানুষের মনে জন্মলগ্ন থেকে এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে এসেছে রেল। এগিয়ে এসেছে দেশের ও দশের সেবায় নানা প্রয়োজনে। রেলের কারণে সৃষ্টি হয়েছে রূপকথার, জমা হয়েছে হাজার সুখ দুঃখের গল্প, সমৃদ্ধ হয়েছে নানান অভিজ্ঞতায়, জন্ম দিয়েছে নানান প্রযুক্তিগত বিস্ময়ের, নানা প্রান্তের মানুষকে কাছাকাছি আনার কাজ সুচারু ভাবে করেছে সে এবং তাই এসেছে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, নবজন্ম হয়েছে একটি জাতির, এসেছে একাত্ম বোধ।

রেলের প্রতি টান উপেক্ষা করা কিছু মানুষের পক্ষে সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তারা ছুটে যায় এর টানে, কখন এতে ভ্রমণ করে, কখনো বা এর ছুটে চলা দেখে, কখন বা ছবি তুলে স্মৃতির গভীরে লালিত করা হয় এই রেলপ্রেমকে। এই রেল-পাগলের দল আজকের যুগের আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে রেলের অন্দরের প্রতিটা খুঁটিনাটির খোঁজ আমজনতার সামনে হাজির করে বিভিন্ন মাধ্যমে। এরকমই কিছু মানুষ প্রতিবারের মতন এবারও কলম ধরেছেন আমাদের নববর্ষ সংখ্যার জন্যেও।

রায়বরেলির মডার্ন কোচ ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার এবং একজন বিদ্বান রেলপ্রেমী শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র এবারে শুনিয়েছেন ১৮৫৫ সালের এক ব্রিটিশ অভিযাত্রীর ভারতে এসে প্রথম রেল ভ্রমণের গল্প। তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে নৈশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন ছিল জানতে হলে এই কাহিনী অবশ্য পাঠ্য।

এর পরেই টরে-টক্কার যুগ থেকে সোজা মুঠো ফোনের যুগে এনে ফেলার কাজটি করেছেন শ্রীমান অনমিত্র বোস। প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এর আগেও বহু লেখায় জানা অজানা নানান তথ্যের সন্ধ্যান দিয়েছে তার কলম। তার এবারের নিবেদন কলকাতার জীবন রেখা অর্থাৎ মেট্রোর বিভিন্ন রেকের খুঁটিনাটি।

এখনকার রেল ভ্রমণের একটি জিনিস নিয়ে হাজারো অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায় তা হলো খাবার। কখন নিম্নমান, অথবা স্বাদ-হীন আবার কখন বা পরিমাণে কম এসমস্ত নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। অধিকাংশ ট্রেনে প্যান্ট্রি কার থাকলেও খাবার মূলতঃ কোনো না কোনো স্টেশনেই বানানো হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েক দশক আগেও ছবিটা ছিল ভিন্ন। অধিকাংশ যাত্রী খাবার তখন বহন করতেন। আর বাকিদের জন্য প্যান্ট্রি কার নয় ছিল ডাইনিং কার। চলন্ত ট্রেনের রেস্তোরায় বসে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সাথে ভ্রমণের এক টুকরো স্মৃতি হাতড়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী সৌমিত্র পাল।

বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হিসেবে বাংলার নাম সেই মনসামঙ্গল থেকেই শোনা যায়। যদিও বাস্তবে এসে তার উল্টোটাই দেখে এসেছে এখনকার প্রজন্ম। হুগলীর তীরের দু-প্রান্তই এক সময় বিভিন্ন কল-কারখানার আওয়াজে সরগরম থাকতো। উৎপাদিত পণ্য আমদানি বা রফতানির জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছিল জেটি এবং রেল সংযোগ এবং সংলগ্ন ইয়ার্ড। তারপর একে একে নিভেছে বাতি, সদাব্যস্ত উপনগরে আজ শ্মশানের নিস্তব্ধতা, দাড়িয়ে আছে কিছু ইটের নোনা ধরা ইমারত, পড়ে আছে কিছু অব্যবহৃত রেল লাইন। এমনই কিছু হারিয়ে যাওয়া রেলপথের সন্ধানে বেড়িয়েছেন অর্কোপল সরকার এবং তুলে এনেছেন এক টুকরো অতীত।

জন্মস্থান লন্ডন থেকে কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে চলে আসার পর কিশোর মনের দোনামনা প্রশমিত করে এবং লন্ডনের প্রখ্যাত টিউব রেলকে পেছনে ফেলে ট্রাম কি করে সেই কিশোর মনে জায়গা করে নিল সেই মিষ্টি অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন শ্রী উদিত রঞ্জন গুপ্ত।

## সত্যজিৎ ১০০


## রেল ক্যানভাস

এটি একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উৎপন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যের e-পত্রিকা সংস্করণ। এই e-পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে TrainTrackers -এর নিজস্ব সৃষ্টি এবং স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত। এই সংস্করণ অথবা e-পত্রিকা সম্বন্ধিত কোনো প্রকার জিজ্ঞাস্য থাকলে যোগাযোগ করুন – railcanvaz@gmail.com

প্রকাশক
***TRAINTRACKERS***

সম্পাদক
*রুদ্রনীল রায় চৌধুরী*

যুগ্ম সম্পাদক
*অর্কোপল সরকার*

গ্রন্থন, পরিকল্পনা ও সংকলন
*রুদ্রনীল রায় চৌধুরী*

সহকারী সম্পাদক
*অনমিত্র বোস*

সহকারী সম্পাদক
*শ্রেয়া চক্রবর্তী*

***Team TRAINTRACKERS***

*সোমশুভ্র দাস*
অধ্যক্ষ

*রুদ্রনীল রায় চৌধুরী*
সাধারণ সম্পাদক

*অঞ্জন রায় চৌধুরী*
কোষাধ্যক্ষ

*অর্কোপল সরকার*
জনসংযোগ

*শুভদ্যুতি বোস, অনমিত্র বোস*
সদস্যবৃন্দ

*সৌরভ দত্ত, সাত্বিক গুপ্ত, শৌর্য বসু*
সহ-সদস্যবৃন্দ



© TrainTrackers. সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই e-পত্রিকার সমস্ত বিষয়বস্তু অর্থাৎ রচনা, ছবি, প্রবন্ধ, কাহিনী, নকশা, শিল্পকলা -র সমস্তকিছু স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত। কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, এইসবের কোনো প্রকার প্রতিলিপি, অনুলিপি বা পুনরুৎপাদন কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই e-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত (গুলি) সম্পূর্ণ ভাবে লেখকদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র। তা কোনোভাবেই TrainTrackers -এর এবং ভারতীয় রেলের সরকারি নীতি বা মতামত বা দর্শন হিসেবে গণ্য করা যাবে না। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই, প্রদানকারী লেখক, চিত্রগ্রাহক বা তথ্যপ্রদানকারি ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে এই e-পত্রিকার বিষয়বস্তু একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, যে TrainTrackers সেই প্রদানকারীদের মতামতের সাথে কোনো প্রকারে সহমত পোষণ করে বা ভবিষ্যতে করবে। এবং এই প্রসঙ্গে এও জানানো হচ্ছে যে এই e-পত্রিকায় প্রদানকারী বিষয়বস্তুগুলির যথাযোগ্যতা, সম্পূর্ণতা ও মূল্যায়নের দায়ভার TrainTrackers –এর ওপর কোনোভাবেই বর্তায় না। সেগুলি সম্পূর্ণভাবে প্রদানকারীদের বিবেচ্য।

দেড়শো বছরে অতিক্রান্ত কলকাতার ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছেন শহরবাসীর একাংশ। সাহায্য এবং সমর্থন এসেছে প্রবাসীদের থেকেও। কিন্তু তাও সরকারের চূড়ান্ত অবহেলা ও উদাসীনতা এবং রাজনৈতিক চক্রান্তের বলি হয়ে ক্রমশ মহানগরীর বুক থেকে মুছে যাচ্ছে ট্রাম। শেষ চেষ্টা হিসেবে অস্ট্রেলীয় রবার্তোর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে শহরের কিছু ট্রামপ্রেমী উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে ট্রামের সার্ধশতবর্ষ পালন করে কিছু দিনের জন্য হলেও কি করে ট্রামকে আবার চর্চায় নিয়ে এল তার বর্ণনা করা হয়েছে ট্রামের দেড়শোয় পা... প্রবন্ধে।

বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের হয়ে তথ্য সমৃদ্ধ বিভিন্ন লেখা দ্বারা আমাদের নিয়মিত মনোরঞ্জনের কাজটি করে এসেছেন ফিরোজ ইসলাম। এবার রেল ক্যানভাসের হয়েও তার তথ্যের ঝুলি হাতড়ে তুলে এনেছেন শতাব্দী প্রাচীন জুবিলি ব্রিজ নিয়ে একটি অনবদ্য লেখনী।

একাধারে একজন একনিষ্ঠ রেলকর্মী সঙ্গে আদ্যন্ত রেলপ্রেমী, এই প্রগাঢ় মিলনের মিষ্টি মধুর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে নিয়মিত ভাবে রেল ক্যানভাসের হয়ে কলম ধরেন শ্রী বিপ্লব দেবনাথ। এবারের পর্বে উঠে এসেছে তার দৈনন্দিন কর্মজীবনের নানান টুকরো টুকরো ঘটনার বিবরণ।

অতিমারির সময় দেশের সেবায় সবার আগে এগিয়ে এসেছিল রেল। লক ডাউন এবং করোনা কালে সকল বাধা বিপত্তির পেরিয়ে জনগণের মুখে খাবার তুলে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন প্রতিটি রেলকর্মী। পণ্য পরিবহনের সাহায্যে অতিমারি পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ভারতীয় রেলের ঘুরে দাঁড়ানোর আখ্যান ব্যাখ্যা করেছেন শ্রী নবায়ন দত্ত।

দেশ জুড়ে বৈদ্যুতিককরণের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ডিজেল ইঞ্জিনগুলি। নিত্যদিন বহু ইঞ্জিন বসে যাচ্ছে চিরতরে। রেলের বেশির ভাগ জোনই আর ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের সংস্কারে আগ্রহী নয়। এই অবস্থায় পূর্ব রেল কিভাবে তাদের অধিকাংশ ডিজেল ইঞ্জিনকে এখনো সঠিক ভাবে ব্যবহার করে চলেছে তার তত্ত্ব-তালাশ করেছেন শ্রীমান রক্তিম ভট্টাচার্য।

মিশন ইউনিগেজের জন্যে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের ছোট রেল আজ অতীত। তারা বেঁচে আছে কেবল কিছু মানুষের ক্যামেরায় আর সেইসব অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে। যদিও দেশের আনাচে কানাচে এখনো নগন্য সংখ্যায় বেঁচে আছে তারা। সেরকমই এখনো চালু থাকা মারওয়ার-মাভলি ছোট রেলে ভ্রমণের বিত্তান্ত শুনিয়েছেন শ্রী সোমশুভ্র দাস।

শস্য শ্যামলা বাংলা থেকে জগন্নাথধামের গা ঘেঁষে, পূর্বঘাট পর্বতমালা অতিক্রম করে, রুক্ষ মালভূমি পেড়িয়ে, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার বুক চিরে অবশেষে আরব সাগরের তীরে সুন্দরী গোয়াতে গিয়ে শেষ হয় শ্রীমতী শ্রেয়া চক্রবর্তীর সেবারের ট্রেন যাত্রা। সেই অপূর্ব রেলপথের ছোট্ট সুন্দর বর্ণনা করেছেন তার লেখনীর মধ্যে দিয়ে।

এইসমস্ত লেখনীর মধ্যে দিয়ে সেজে উঠেছে এবারের রেল ক্যানভাসের বৈশাখী সংখ্যা। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই সেই সকল মানুষকে যাদের সহযোগিতায় ফের একবার রেল ক্যানভাস কে হাজির করা গেল পাঠকদের দরবারে। ধন্যবাদ প্রাপ্য সেই সমস্ত লেখক লেখিকাদের যাঁদের লেখা ও চিত্র স্থান করে নিয়েছে এবারের সংখ্যায়। একই সঙ্গে ধন্যবাদ সকল শুভাকাঙ্খীকে।

**রুদ্রনীল রায় চৌধুরী**

# রেল ক্যানভাস

TrainTrackers এর একটি প্রয়াস

# সূচীপত্র

রাতের মেল ট্রেন
প্রশান্ত কুমার মিশ্র

তিলোত্তমার লাইফ লাইন
অনমিত্র বোস

ডাইনিং কার
সৌমিত্র পাল

হারিয়ে যাওয়া রেলপথের সন্ধানে
অর্কোপল সরকার

কলকাতার ট্রামের কড়চা
উদিত রঞ্জন গুপ্ত

ট্রামের দেড়শোয় পা...
রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

# রেল ক্যানভাস

TrainTrackers এর একটি প্রয়াস

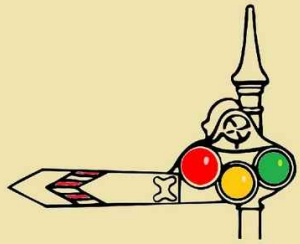

# সূচীপত্র

জুবিলি ব্রিজ
ফিরোজ ইসলাম

রেলপ্রেমীর ডাইরি থেকে...
বিপ্লব দেবনাথ

অতিমারির আবহে পণ্য পরিবহণ
নবায়ন দত্ত

পূর্ব রেলের 'অ্যালকো' অনুরাগ
রক্তিম ভট্টাচার্য

আরাবল্লির বুকে...
সোমশুভ্র দাস

দুধসাগরের তীরে...
শ্রেয়া চক্রবর্তী

ভারতীয় রেলের বৈচিত্র্যময়
বৈদ্যুতিক লোকো লিভারি

# রাতের মেল ট্রেন

## প্রশান্ত কুমার মিশ্র

১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট পূর্ব ভারতের প্রথম ট্রেনটি হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত প্রথম যাত্রা শুরু করে এবং এর কিছুদিন পরে লাইনটি পান্ডুয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়; এবং এর ছমাসের মধ্যে, রাণীগঞ্জ পর্যন্ত লাইন পাতার কাজও সম্পন্ন হয়। এরপর, ১৮৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি পান্ডুয়া থেকে বর্ধমান এবং বর্ধমান থেকে রাণীগঞ্জ এই দুই সেকশনেই প্রশিক্ষণমূলক এবং পণ্যবাহী পরিষেবা চালু করা হয়েছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (EIR) কোম্পানির হাওড়া-রানীগঞ্জ ১২০ মাইল রুটের উদ্বোধন, তৎকালীন পরিস্থিতির বিচারে, মনুষ্যদ্বারা গৃহীত সুবিশাল কারগরি কর্মযজ্ঞগুলির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়। পরবর্তী কালে মোট ১৩৫০ মাইল দৈর্ঘ্যের এই সুদীর্ঘ রেলপথটি গঙ্গা, শোন, যমুনা, এবং সতলুজের মতো নদীগুলির ওপর সফল ভাবে সেতুবন্ধন করে ভারতের সবচেয়ে উর্বরতম অঞ্চল অতিক্রম করে; সমুদ্রের সাথে দেশের সবচেয়ে জনবহুল এবং প্রাচীন শহরগুলিকে সংযুক্ত করতে চলেছিল। এবং তার সাথে এই রেলপথ প্রত্যন্ত এবং দুর্গম জেলাগুলির খনিজ ও খাদ্য শস্য পরিবহন; কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক অবস্থার উন্নতি, লক্ষ লক্ষ মানব জাতির মনকে প্রসারিত করার দুরূহ কাজটি সফল ভাবে সম্পন্ন করতে চলেছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে পরবর্তী কালে এই রেললাইন অচিরাৎ ভারতের লাইফ লাইনে পরিণত হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে ১৮৫৫-৫৬ সালে, EIR রুটে মাত্র দুটি ট্রেন চলত। প্রথম ট্রেনটি রাণীগঞ্জে এবং দ্বিতীয়টি পান্ডুয়া পর্যন্ত যেত। প্রথম ট্রেনটি সকাল ৯টায় হাওড়া থেকে ছেড়ে বেলা ১২টা ৪০এ বর্ধমানে পৌঁছতো এবং দুপুর ১টা ৪০এ বর্ধমান থেকে ছেড়ে, একই দিনে বিকেল ৪টে ৪২এ রাণীগঞ্জে পৌঁছতো। ডাউন ট্রেনটি পরের দিন সকাল ৯টা ১০এ রাণীগঞ্জ থেকে ছাড়তো এবং মাঝে ১২টা ২ মিনিট থেকে ১টা বেজে ৫ মিনিট পর্যন্ত বর্ধমানে প্রায় এক ঘন্টার মধ্যাহ্নভোজের বিরতি দিয়ে একই দিনে বিকেল পৌনে পাঁচটায় হাওড়া পৌঁছতো। হাওড়া থেকে দ্বিতীয় ট্রেনটি বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৪৮ মিনিটে পান্ডুয়ায় পৌঁছাতো।

এই দুটি ট্রেন ছাড়াও, প্রতি রাতে একটি মিক্স ট্রেন, রাত সাড়ে আটটায় হাওড়া থেকে ছাড়তো যার মধ্যে একটি পণ্যবাহী ওয়াগন, ৫-৬টি তৃতীয় শ্রেণি, দুটি দ্বিতীয় শ্রেণি এবং একটি প্রথম শ্রেণির কামরা থাকতো এবং সেটি রাণীগঞ্জে পৌঁছাতো পরের দিন সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে। এবং সেটিই ছিল দেশের প্রথম টাইমটেবিল অনুযায়ী পণ্যবাহী রেল পরিষেবা। ডাউনের দিকে এই ট্রেনটি রাণীগঞ্জ থেকে প্রতি রাতে সাড়ে আটটায় ছেড়ে পরের দিন সকাল ৭টা ৪০এ হাওড়ায় পৌঁছাতো।

একজন ইংরেজ অভিযাত্রীর একটি ভ্রমণ বিবরণ পাওয়া যায়, যিনি ১৮৫৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর, রাতের মেল ট্রেনে হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জে ভ্রমণ করেছিলেন, এবং ভারতে রেলপথে রাতের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে।

সেইসময় ইউরোপিয়দের সবচেয়ে পছন্দের হোটেল ছিল 'দ্য অকল্যান্ড' (উইলসন অ্যান্ড কোং), যার বেসমেন্টে একটি কফিশপ আর রেস্তোরাঁ ছাড়াও ছিল ওয়াইনশপ, মিষ্টির দোকান, মুদিখানা, সুগন্ধির দোকান। এসব ছাড়াও ছিল, পশমী পোশাক, দর্জি এবং হার্ডওয়্যারের দোকান। এছাড়া একটি সেলুনও ছিল। অন্যান্য হোটেলগুলি ছিল গার্ডেনরিচের বব্রী'স, হাওড়ার রেলওয়ে হোটেল, হার্ডি অ্যান্ড কোং'এর ফ্যামিলি হোটেল; কিং'স হোটেল; মাউন্টেন হোটেল; গ্লেড অ্যান্ড কোং-এর ফ্যামিলি হোটেল, স্পেন্সার্স আর ভিভিয়ের'স (ফরাসি হোটেল)। বোর্ডিংএর জন্য প্রতিদিন ৫ টাকা, যার মধ্যে একটি ছোট বেডরুম এবং সাধারণ অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত ছিল; সকাল ৬টায় কফি পরিবেশন করা হতো; সকালের জলখাবার সকাল ১০টায়; দুপুর ১টায় লাঞ্চ দেওয়া হতো এবং রাতের ডিনার সন্ধ্যে ৭টায়।

কলকাতার হোটেল থেকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে তখন প্রায় এক ঘন্টা লাগতো, যদিও

দূরত্ব ছিল দুই মাইলেরও কম। যাত্রার প্রথম ধাপে থাকতো একটি ঘোড়াগাড়ী বা একটি পালকি গাড়ি - একটি পালকির তলে চারটে চাকা লাগিয়ে সেটিকে একটি ঘোড়া দিয়ে টানা হতো। পরবর্তী ধাপে থাকতো নৌবিহার। সুন্দর, গতিহীন, শান্ত, শীতল অথচ ঠাণ্ডা নয় এমন পরিবেশে, মেঘহীন তারা ভরা আকাশের নীচে হুগলি নদীর রূপালী জলে নৌকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মনে রাখার মতো। ভাগীরথী বা প্রচলিত অর্থে গঙ্গা নদীর প্রস্থ টেমসের চেয়ে বেশি ছিল এবং তখনকার সময় নদী পারাপারের জন্য ফেরি পরিষেবাই যথেষ্ট ছিল। নৌকাটি হুগলির উত্তর তীরের কাছে আসার সাথে সাথে হাওড়া স্টেশনের অগোছালো শেডগুলি দেখতে পাওয়া যেত। সেইসঙ্গে অপর পাড়ে ছেড়ে আসা কোলাহল আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠত; তার সাথে ছিল বিশৃঙ্খলা, যা দমন করার ক্ষমতা দুই বা তিনজন পুলিশ কর্মচারীর ছিল না।

হাওড়ায় রেলওয়ে টার্মিনাসের অবস্থানটি অত্যন্ত সুকৌশলে নির্বাচন করা হয়েছিল। ক্লাইভ স্ট্রিট এবং কাস্টম হাউসের একদম বিপরীতে এবং নদীর অপর পারে। স্টেশন বিল্ডিংটি ছিল গ্রিসিয়ান এবং গথিক স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গমে তৈরী এক মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য এবং একই সঙ্গে রেলওয়ে লোকোমোশনের অদ্ভুত জগতের প্রবেশদ্বার – অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি!

হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিং হলটি প্রায় কলকাতার হোটেল কক্ষের মতো বড়: চারটি সাদা দেয়াল, একটি বাদামী বর্গাকার টেবিল, এবং তিনটি কাঠের হাতলযুক্ত চেয়ার, যদিও সেগুলি মোটেও কোনো ক্লাবের কফিশপের মতো আরামদায়ক নয়। জানালার বাইরে মাঝেমধ্যে ঘোড়াগাড়ির ঝমঝম শুনতে পাওয়া যেত, বা সন্ধ্যার কাগজ বিক্রি করা হকারদের চিৎকার, মশার বিষণ্ণ গুঞ্জন, অন্যান্য পোকামাকড়ের অনুনয়, আর মাঝে মাঝে কিছু পালকি বহনকারীর বৈচিত্র্যময় আওয়াজ। বুকিং অফিসটি ছিল একটি বড়, উঁচু, প্রশস্ত, এবং গাছগাছালিতে ঘেরা উঠোনের সাথে সংযুক্ত একটি ঘর, যার সাথে ছিল একটি খোলা বারান্দা; সেই ঘরে কাঠ এবং জাল দিয়ে ঘেরা টিকিট জানালার পিছনে একটি সাদা সুতির জ্যাকেট পরিহিত স্থানীয় এক কেরানি বসেছিলেন। তাঁর সামনে ছিল একটি স্ট্যাম্পিং মেশিন যাতে আয়তাকার কার্ডবোর্ডের টিকিট স্ট্যাম্পিং করে যাত্রীদের দেওয়া হতো। রানিগঞ্জ অবধি প্রথম-শ্রেণীর টিকিটের দাম তখনকার দিনে ছিল এগারো টাকা চার আনা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট যথাক্রমে ৫ টাকা ১০ আনা এবং এক টাকা ১৪ আনা। সন্ধ্যায় প্ল্যাটফর্মটি অপেক্ষাকৃত কম জনাকীর্ণ ছিল, কিছু তেলের বাতি দুর্বল ভাবে আলোকিত করছিল কারণ ১৮৫৫ সালের কলকাতায় তখনো গ্যাস-লাইটের প্রবর্তন হয়নি। রংবিহীন কাঠের ভাড়া গাড়িগুলো উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল; ট্রেনের প্রথম শ্রেনীটি একেবারে খালি, দুটি দ্বিতীয় শ্রেনী কিছুটা ইউরোপীয় এবং স্থানীয়দের মিশ্র জনগোষ্ঠীর দখলে; এবং ছয় বা সাতটি তৃতীয়-শ্রেণী, সেখানে বিশাল জনসমাগম, যাদের উপর EIR-এর ভাগ্য নির্ভর করে, কিন্তু ঐসমস্ত যাত্রীদের কাছে সেই সময়ের রেলযাত্রা মোটেই সুখকর বা আনন্দদায়ক ছিল না। অথচ কোম্পানি একেবারে নূন্যতম পরিষেবার বদলে এদের কাছ থেকেই মোটা অঙ্কের লাভ করতো। কিন্তু মজার ব্যাপার ছিল যে ওই যাত্রীরা পরিষেবা নিয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপও করতো না।

ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী "আপ" এবং "ডাউন"-এর বিদ্যমান ইংরেজি ব্যবহারকে বিপরীত করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিল এবং ভৌগলিক বাস্তবতা অনুসারে যা যুক্তিসঙ্গত ছিল। রেল প্রযুক্তিগত সুবিধার জন্য একটি শব্দগুচ্ছকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। কলকাতা থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটিকে "আপ" বলা হতো কারণ এটি গাঙ্গেয় অববাহিকা দিয়ে ওপরদিকে অগ্রসর হতো, যা কিনা তৎকালীন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের ভাষায় "উপরের দেশে" যাওয়া বোঝাতো। এই ব্যাপারটি ইংল্যান্ড থেকে আগত নব্য অভিযাত্রীর কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হয়েছিল, কারণ ভারতের তৎকালীন রাজধানীর কাছে আসার সময়ও তিনি কিনা ডাউন-ট্রেনে ছিলেন, যা কিনা আবার ইংরেজ নিয়মের পরিপন্থি। কারণ ইংল্যান্ডে বড় শহরের দিকে যাওয়া ট্রেন গুলিকে আপ-ট্রেন বলা হতো।

ভারতের মতো দেশে রেলওয়ে প্রবর্তন, নিঃসন্দেহে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। রেল এসেছে এবং সঙ্গে বয়ে এনেছে যান্ত্রিক সময়ানুবর্তিতা যা কঠোর, যা নীরব কিন্তু কার্যকরী। রেল মানুষকে সময়ের সাথে চলতে বাধ্য করতে পেরেছে। ঘড়ি যখনই ঠিক সময় দেখায়, অমনই রেলের ঘণ্টা বেজে ওঠে, এবং আপাতঘুমন্ত ইঞ্জিন আচমকা জীবিত হয়ে হুইসেল বাজিয়ে গন্তব্যের দিকে তার যাত্রা শুরু করে - অদম্য এই ধাতব ত্রয়ী যুগ যুগ ধরে সেই পাঠ শেখাতে সফল হয়েছে যা রক্ত-মাংসের কোনো মানুষ এত সহজে শেখাতে পারতো না। যার ফলে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাত্রীরা রেলস্টেশনে সময়ের আগেই এসে পৌছে যায়। এটিই রেলের বৈশিষ্ট্য, এবং রেলেরই একমাত্র ক্ষমতা আছে সমস্ত প্রজাতির মানুষ ও দেশকে একটি অভিন্ন সভ্যতায় পরিণত করার। প্রতিটি জাতির নিজস্ব অদ্ভুত পথযান রয়েছে; প্রতিটি সমুদ্র, প্রতিটি নদীর নিজস্ব অদ্ভুত নৌযান আছে; কিন্তু ট্রেন সারা বিশ্বেই ট্রেন; সেই সংক্ষিপ্ত বাঁশি, সেই দৃঢ় অথচ নীরব টান, সেই একঘেয়ে চাকার আওয়াজ, ল্যাঙ্কাশায়ারের কারখানা বা দক্ষিণ ডেভনের লাল ক্লিফ, অথবা ফ্রান্সের সমতলভূমি, কিম্বা স্টাইরিয়ার রুক্ষ পথ, কখনো বা হাভানার গ্রীষ্মমন্ডলীয় পাহাড় বা পশ্চিম আমেরিকার বন্য জঙ্গল; পর্যটকের কাছে রেলের অভিজ্ঞতা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে একইরকম।

বালি এবং শ্রীরামপুর পেরিয়ে ট্রেন হাওড়া থেকে একুশ মাইল দূরে ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে পৌঁছায়। এটি গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত দুই মাইল অবধি প্রসারিত এবং অভ্যন্তরীণ দেড় মাইল বিস্তৃত একটি বসতি যা ১৬৭২ সাল থেকে ফ্রান্সের দখলে ছিল। শহরটি বাগান এবং গাছের সারি দিয়ে ঘেরা, বাড়িগুলি দেখতে সুন্দর, পরিষ্কার এবং প্রায় প্রতিটির সামনে এক ধরণের কলোনেড থাকতো। শহরের উত্তরে একটি ঢিবি এবং খাদ তখনও দৃশ্যমান ছিল যা একসময়ের বিখ্যাত দুর্গের অবশিষ্টাংশ।

রেলওয়ে স্টেশনটি ফরাসি সীমানার ঠিক বাইরে তৈরী করা হয়েছিল; চন্দননগরের মধ্যে যে জায়গাটি লাইন পাতার জন্য প্রথমে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেখানে ফরাসি কর্তৃপক্ষর কাজের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। যার ফলে অসুবিধা দেখা দেয় এবং নিষ্পত্তির জন্য ফরাসি এবং ইংরেজি সরকারের কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল। বহু মাস আলোচনার পর, অবশেষে রেলকে ফরাসী সিমানার বাইরে কেবলমাত্র সেই জমি দিয়েই

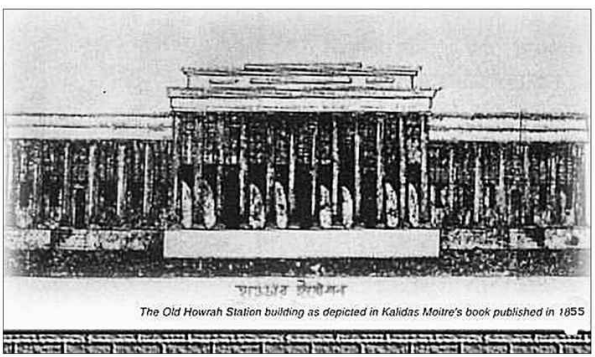

The Old Howrah Station building as depicted in Kalidas Moitre's book published in 1855

নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যা কিনা সন্দেহাতীত ভাবে ইংরেজদের দখলে ছিল।

যখন কলকাতা থেকে দিল্লি পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কথা ছিল, তখন সরকার ফরাসি কর্তৃপক্ষকে চন্দননগরের মধ্য দিয়ে রেলপথ নিয়ে যাওয়ার জন্য জমি অধিগহনের অনুমতি চায়; আর তার বদলে শহরবাসীদের জন্য থিয়েটার এবং অন্যান্য বিনোদনের জায়গা বিনামুল্যে নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। চন্দননগরের কাছে কলকাতার ধনীদের জন্য একটি অবকাশকালীন গন্তব্যে পরিণত হওয়ার এবং রাজধানীর সাথে অবিচ্ছিন্ন এবং সহজ যোগাযোগের সুযোগ ছিল। কিন্তু এই লোভনীয় শর্ত ফরাসিরা প্রত্যাখ্যান করে।

ট্রেন ক্রমে হুগলীতে পৌছয়। সে সময়ের হুগলী স্টেশনটি ছিল সবুজ রঙের জানলা-দরজা যুক্ত একটি ছোট্ট সাদা বাংলো; স্টেশনের নামটি তিনটি ভাষায় লেখা: ইংরেজি, ফারসি এবং সবশেষে বাংলায় যা কিনা প্রদেশের মাতৃভাষা। এই তিন ভাষার স্কিমটি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে EIR দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল এবং ছোটখাটো পরিবর্তনের সাথে ভারতীয় রেল তা আজপর্যন্ত অনুসরণ করে চলেছে। ১৫৪০ সালে, পর্তুগিজরা হুগলিতে একটি দুর্গ তৈরি করেছিল, এবং যার বিপরীতে ১৫৯৯ সালে ব্যান্ডেলের পুরানো গির্জাটি নির্মিত হয়েছে যার কিছুটা অংশ ট্রেনে বসেও দেখা যেত।

হুগলী থেকে কয়েক মাইল দূরে ট্রেন এগিয়ে চলে সাতগান সেতুর উপর দিয়ে, যার স্তম্ভগুলি ইটের এবং উপরিভাগেটা কাঠের। প্রায় সোয়া লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই সেতুটির আকর্ষণীয় চেহারা ছিল। নির্মাণ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে সেতুর উপরকার কাঠামোতে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ধরনের সমস্ত কাঠের সুপারস্ট্রাকচার লোহার কাঠামো দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।

ট্রেন যখন বর্ধমানে পৌঁছল তখন মধ্যরাত হয়ে গেছে। এই স্টেশনটি পরবর্তী কালে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বের ট্রেনগুলির মিলনস্থল হয়ে উঠতে চলেছিল। দেশের প্রথম রেলওয়ে রিফ্রেশমেন্টরুমটিও বর্ধমান স্টেশনে চালু করা হয়েছিল। এটি দেখে ইংরেজ ভ্রমণকারীদের মনে পড়ে যেতে পারতো, ট্রেন্ট ভ্যালি চালু হবার আগের বার্মিংহামের কথা; সেই অন্ধকার এবং নির্জন লোহার ছাদওয়ালা স্টেশনটি, প্রায় নিভে যাওয়া বাতির আলোআঁধারি মধ্যে দিয়ে সাইডিংএ রাখা কামরাগুলির ভৌতিক অবয়ব ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ যখন একটি দীর্ঘ হুইসেল গ্র্যান্ড জংশন থেকে ট্রেনের আগমনবার্তা ঘোষণা করতো, মুহূর্তের মধ্যে স্টেশনটি যেন দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, এবং নির্জনতা দূর করে অচিরাৎ পোর্টার, ক্যাব-ড্রাইভার, যাত্রী এবং হোটেল ওয়েটারদের ভিড়ে গমগম করে উঠতো।

বর্ধমান স্টেশনের দৃশ্যটি যদিও অন্যরকম ছিল। স্বল্পালোকিত সাদা চুনকাম করা অপরিচ্ছন্ন বর্ধমান রিফ্রেশমেন্ট রুম; ঘুমন্ত খিদমতগারদের উপস্থিতি এবং তাদের ইংরেজ সাহেবদের রুচির প্রতি বিরক্তিভাব। কারণ সাহেবরা তাদেরকে সময় অসময় রাতের আধাঘুমন্ত অবস্থাতেও দৌড়াতে বাধ্য করতো। যদিও বর্ধমান স্টেশন এবং

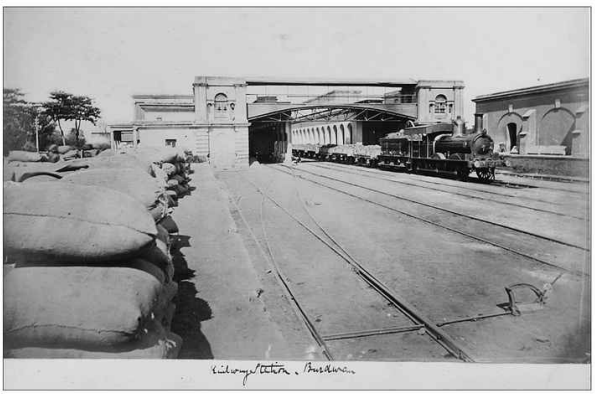

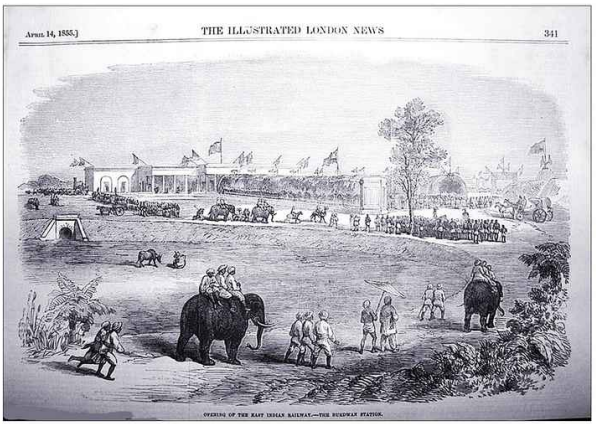


রিফ্রেশমেন্ট-রুমের অনেক উন্নতি প্রয়োজন; কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মাঝরাতে একজন বিরক্ত, আধা-ঘুমন্ত খিদমতগারকে জাগিয়ে তুলে দূরের কোনো ডাক বাংলোর একটি আপাতঃনির্জন, আলোবাতি ও বিছানাহীন ঘরে আশ্রয়ে নেওয়ার চেয়ে এবং সারারাত নিরন্ন অবস্থায় কাটানোর চাইতে, স্টেশনেই থাকলে অন্তত একজন সহযাত্রীর সঙ্গ পাওয়া গেলেও যেতে পারে, আর যেখানে অন্তত কয়েকটা বাতি জ্বলছে এবং রিফ্রেশমেন্ট রুমের লকারে হয়তো কয়েক বোতল বিয়ারও পাওয়া যেতে পারে।

বর্ধমানে যাত্রীসাধারণকে নির্দিষ্ট হারে রিফ্রেশমেন্ট প্রদান করা হতো যেমন:- বোর্ডিং এবং লজিং, প্রতিদিন ৩ টাকা; বিছানা ১ টাকা; রাতের খাবার ১ টাকা, গরম নিলে ১ টাকা ৪ আনা; সকালের জলখাবারও ১ টাকা, গরম নিলে ১ টাকা ৪ আনা; টিফিন বা লাঞ্চ গরম নিলে ১ টাকা ৪ আনা; ঠান্ডা নিলে ১২ আনা; পার্সেল নিলে দেড় টাকা; Allsop's Pale Ale, কোয়ার্টার বোতল প্রতি ১২ আনা; পাইন্ট বোতল ৬ আনা; বিয়ার কোয়ার্টার বোতল প্রতি ১২ আনা, পাইন্ট বোতল ৬ আনা; শেরি কোয়ার্টার বোতল প্রতি ২ বা ৩ টাকা, পাইন্ট বোতল ১ বা দেড় টাকা, পোর্ট ওয়াইন কোয়ার্টার বোতল প্রতি ২ বা সাড়ে তিন টাকা; ক্যাস্টিলন ব্র্যান্ডি কোয়ার্টার বোতল প্রতি ২ টাকা ৪ আনা, গ্লাস প্রতি ৪ আনা, সোডা ওয়াটারের সাথে আট আনা, লেমনেডের সাথে নিলে আট আনা; সোডা ওয়াটার প্রতি বোতল ৪ আনা এবং লেমনেড প্রতি বোতল ৪ আনা।

আগেকার সময়ে ভারতীয় ডাকঘর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যাত্রীদের পালকি ভাড়া দেওয়া হতো। এটি মূলত ছিল একটি কাঠের প্রশস্ত বাক্স, প্রায় ৮ ফুট লম্বা, ৪ ফুট চওড়া এবং ৪ ফুট উঁচু; কাঠের খড়খড়িগুলি এমনভাবে লাগানো ছিল যাতে সহজে খোলা-বন্ধ করা যায় এবং যারা সূর্যের তেজ, রাতের স্যাঁতসেঁতে শিশির বা বৃষ্টির ছাঁটকে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র সতেজ বাতাসকেই ভেতরে আসতে দিত। পালকিতে ভ্রমণের হার ছিল সাড়ে তিন বা ৪ আনা প্রতি মাইল, প্রতিদিন ১০০ মাইল (বা ২৪ ঘন্টা); ভিতরে ভ্রমণকারীর পূর্ণ দৈর্ঘ্যে হেলান দেবার জন্য চামড়া দিয়ে মোড়া একটি পুরু গদি দেওয়া থাকতো, যার উপরে দুটি বালিশসহ একটি ছোট পারস্য গালিচা রাখা থাকতো; মাঝখানে একটি ছোট পাশবালিশও থাকতো যাতে যাত্রী আরামদায়কভাবে যাত্রা করতে সক্ষম হয়। উপরের প্রান্তে একটি শেলফ এবং ড্রয়ার ছিল এবং পাশের অংশে কেবল বড় আকারের পকেটের মতো জাল, যেখানে ভ্রমণকারীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা যেতে পারতো। প্রতিটি পালকি চারজন বহনকারী মিলে কাঁধে বহন করতো। এবং আগে রাণীগঞ্জে যাওয়ার জন্য এই ধরনের পালকিতে করে যেতে হতো; এবং তাতে করে রাতভর দীর্ঘযাত্রার পরেও কলকাতা থেকে খুব বেশী হলে চল্লিশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করা যেত।

রেলপথ চালুর পরে, মধ্যরাতের মধ্যেই প্রায় ষাট মাইল অতিক্রম করা সম্ভবপর হয়ে পড়ে এবং সকালের মধ্যে কলকাতা থেকে ১২০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলা যেত। রেল পরিষেবা চালুর সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে জুলাইয়ের কোনো এক

বর্ষণমুখর রাতে কোনো এক বিদেশি পর্যটক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রেলের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় নির্দ্বিধায় এবং নিশ্চিন্তে যাত্রা করতে পারেন। তিনি তখন তাঁর দরিদ্র পালকীবাহকদের জন্য কোন উদ্বেগ ছাড়াই রাতে ঘুমাতে পারবেন। এবং সন্দেহাতীত ভাবে এও বলা যায় যে বর্ষাকালের ঘোর অন্ধকার রাতে, বাংলা প্রদেশের ভিজে, পিচ্ছিল, অজানা বিপদসংকুল কাঁচামাটির সড়কপথ এড়িয়ে, কোনো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই নিজগন্তব্যে পৌছনো সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল।

বর্ধমান থেকে পনেরো মাইল দূরে, বায়ুমণ্ডল শীতল এবং পরিষ্কার হয়ে ওঠে; জমি ক্রমেই অসমান আর রুক্ষ হয়ে যেতে থাকে; রেল বাঁধের উপর যদিও গাছপালার কিছু চিহ্ন ছিল। কিছু লোক দোষারোপ করবে যে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে খুব ধীরগতির ছিল, কিন্তু তা সময়নুবর্তিতা বজায় রাখতো। ট্রেন কিন্তু যথাসময়ে সকাল ছয়টায় রাণীগঞ্জে পৌঁছায়; দশ ঘন্টায় একশ বিশ মাইল খুব দ্রুত নয় - ঘন্টায় বারো মাইল।

রাণীগঞ্জ, একটি ছোট্ট সাদা স্টেশন ভবন, যার সামনে চার চাকার ঘোড়াগাড়ির ভিড়, যেগুলি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করতো। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের রাণীগঞ্জ টার্মিনাস যেখানে সভ্যতার গতিবিধি যেন আকস্মিকভাবে এসে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু, এই রাণীগঞ্জ কয়েক বছরের মধ্যে একটি বড় শহরে পরিণত হতে চলেছিল। এটা প্রত্যাশিত ছিল যে খুব শীঘ্রই এখানে রেলের টার্মিনাস, বিভিন্ন শেড, ট্রেনের ওয়াগন, নর্থ ওয়েস্ট ডক, এবং অভ্যন্তরীণ ট্রানজিট কোম্পানিগুলি ও তাদের দোকানপাট, এবং ভ্রমণকারীদের অভ্যর্থনার জন্য গজিয়ে ওঠা একটি বড় হোটেল আর বিভিন্ন সরাইখান মিলিয়ে শীঘ্রই শিরোনামের চলে আসতে চলেছিল। যা দেখে পরবর্তী কালে স্থানীয়রা একে ছোট কলকাতার বলতে শুরু করেছিল।

রানীগঞ্জে এসে নব্য অভিযাত্রীর মনে হয়েছিল যে, এ যেন কলকাতা ছাড়ার পর ছয় ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া এক অদ্ভুত জগৎ! কয়লা অধ্যুষিতএই ব্লকটি হাজার হাজার বছর আগে গঠিত দামোদর এবং আদজি নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকায় পড়ে ছিল। মিস্টার জোন্স নামে একজন উদ্যোগী স্থাপত্যবিদ, বিশপস কলেজ যার স্থাপত্য দক্ষতার একটি স্মারক, তাঁর দ্বারাই এই খনিগুলি ১৮২০ সালে ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কয়লা খনিগুলি ১০০০ জন পুরুষ ও মহিলাদের নিয়মিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল, প্রধানত বিউরি নামক একটি আদিবাসী উপজাতির। কয়লা খনিগুলির সৌজন্যে দামোদর নদীতেও প্রচুর সংখ্যক নৌকা-চালকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল, যারা বছরে ৮১,০০০ টন কয়লা ২০০ মাইল পথ উজিয়ে কলকাতায় নিয়ে যেত। এরজন্য মণ প্রতি সাড়ে তিন আনা খরচ পড়তো। কিন্তু, এই কয়লা নদীর তীরে বছরভর স্তূপ করা হতো, এবং একমাত্র দামোদরে বন্যা হলেই তা বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত; বছরের বাকি সময় এই কয়লাগুলি খোলা আকাশে রোদে-জলে পড়ে থেকে নষ্ট হতো। রেলপথে পণ্যপরিবহন চালু হবার পর থেকে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

এদিকে, আমাদের পরিচিত রেলযাত্রী এখানেই যাত্রা শেষ হতে দেখে মোটেও খুশি হতে পারেন নি। তিনি অধীর আগ্রহে খোঁজ করেন যে লাইনটি ভবিষ্যতে আর কতদূর সম্প্রসারিত হতে পারে। তাকে জানানো হয় যে বর্ধমান থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত লাইনটি মোটেও আসল রেলপথ নয়, এটি শুধুমাত্র একটি শাখা যা কিনা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোলিয়ারির জন্য তৈরী করা। বর্ধমান থেকে রাজমহল পর্যন্ত মূল লাইনটি সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীরা অস্থায়ীভাবে এই পথ ব্যবহার করেন। এবং সেইসময় বাকি দেশের তুলনায় EIR এর অগ্রগতি এতই ধীরগামী আর অনিশ্চিত ছিল যে এই প্রত্যাশার কথা বিশ্বাস করাও সেই অভিযাত্রীর পক্ষ্যে বেশ কঠিনই ছিল। সবচেয়ে খারাপ যেটা হয়েছিল যে রাজমহল পর্যন্ত বাকিটা পথ তাঁকে পালকীতে যেতে হয়েছিল।

---

লেখক শ্রী প্রশান্ত কুমার মিশ্র পেশাগত ভাবে একজন রেল আধিকারিক এবং বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের অতিরিক্ত মহাকর্মাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত। তাঁর নানাবিধ শখের মধ্যে অন্যতম হলো রেলের জানা-অজানা নানান ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যসমূহ খুঁজে তা লিপিবদ্ধ করা। এবং মূলতঃ তিনি পূর্ব ভারতীয় রেলের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে এবং জানাতে আগ্রহী। রেল ক্যানভাস পরিবারের তরফ থেকে তাঁর এই অসাধারন কাজে আমাদেরকে শরিক করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

*অনুবাদক - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী।*

*নিচের চিত্র - সোমশুভ্র দাস।*

# তিলত্তমার লাইফলাইন

## অনমিত্র বোস

কলকাতায় তখনো কালার টিভির প্রচলন হয়নি ব্যাপকভাবে। বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ প্রায় শেষের পথে, সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' সবে মুক্তি পেয়েছে। বিধাননগরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে জনবসতি। এমন সময়, শহর কলকাতা উপহার পেলো এক অত্যাধুনিক ও যুগান্তকারী যোগাযোগ মাধ্যম, যা সবার কাছে মেট্রোরেল নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে যা হয়ে উঠেছে কলকাতার ধমনী, বদলে দিয়েছে কলকাতার শ্লথ ও যানজটে ভরা যাত্রাকে।

ব্রিটিশযুগের সময় থেকেই তৎকালীন কলকাতার শাসকদের মনে হয়েছিল, শহরটির দরকার একটি দ্রুতগামী ও পরিচ্ছন্ন পরিবহনব্যবস্থা। তখনই তারা লন্ডনের tube এর আদলে তৈরি করতে চেয়েছিলেন একটি ভূগর্ভস্থ রেলপথ, যা রাস্তার উপর চাপ অনেকটাই কমাবে। ১৯১৯ সালে শিমলায় এই ব্যাপারে প্রথম প্রস্তাব আসে ও ক্রাম সাহেব একটি কমিটি গঠন করে। প্রস্তাবিত পথটি ছিল বাগমারী থেকে হাওড়ার সালকিয়া, যা অনেকটাই অধুনা ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর সঙ্গে সদৃশ্য। কিন্তু এটা কোনোদিন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি।

স্বাধীনতার অনেক পরে ১৯৬২ সালে একটু কমিটি গঠিত হয়, কলকাতা মেট্রোর স্থাপনার উদ্দেশে। অবশেষে ১৯৭২'এর এক ঐতিহাসিক দিনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা মেট্রোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ও ১৯৭৩ থেকে নির্মাণকাজ আরম্ভ হয়। ১৯৮৪ সালে প্রথমবার ভারতের মাটির নিচে গড়ালো রেলের চাকা। চালু হলো ভবানীপুর থেকে এসপ্লেনেড এর মধ্যে মেট্রো চলাচল। পথটি ছোট হলেও ভারতের আর্থসামাজিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

কলকাতাবাসীদের নিয়ে যে ট্রেন গুলি সেদিন যাত্রা করেছিল, তারাও সাক্ষী ছিল এক নতুন ইতিহাসের। রেকগুলি ছিল নতুন যুগের বার্তাবহনকারী অগ্রগামী দূত। এই প্রবন্ধ জুড়েই থাকলো তাদের রঙিন ও নিরন্তন পথচলার কিছু মুহূর্ত।

প্রথমবার ভারতবর্ষে কোনো ট্রেন মাটির নিচে যাতায়াত করবে, তাই ট্রেনগুলিও হতে হতো অনন্য, অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী। কিন্তু এই মেট্রো রেলের রেক বানাবে কোন সংস্থা। বিদেশ থেকে আমদানি করার মতো খরচের সাহস মেট্রো রেল কতৃপক্ষের ছিল না। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর অবশেষে ভারতীয় রেলের নিজস্ব কামরা নির্মাতা 'ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি' বা ICF পেলো সেই গুরুদায়িত্ব। রাশিয়ার সহযোগিতায় ICF শুরু করলো মেট্রো কোচ নির্মাণ। বৈদ্যুতিক মোটর ও অন্যান্য ভারী সরঞ্জামের জন্য বরাত দেওয়া হলো আরেক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড বা BHEL, যা একটি নবরত্ন কোম্পানিও বটে। পরবর্তীকালে, যখন মেট্রো পরিষেবা আরো বর্ধিত হলো, সাথে সাথে যাত্রীসংখ্যা ও অনেক গুন বৃদ্ধি পেলো, মেট্রো কর্তৃপক্ষ আরো রেকের প্রয়োজন অনুভব করলো। তখন আবার দায়িত্ব পেল সেই ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি। এবার বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দায়িত্বে থাকলো NGEF অর্থাৎ নিউ গভর্নমেন্ট ইলেক্ট্রিক্যাল ফ্যাক্টরি। নয়টি রেক আসলো এবারের পর্যায়ে, কিন্তু এবারের রেক আরো উন্নত ও শক্তিশালী।

কোচ নির্মাণের অন্যতম দুই স্তম্ভ হলো বগি আর শেল (খোল)। বগি বলতে আমরা সাধারণত: কামরা ভাবি যা আদপেই ভুল। রেলের ভাষায় বগি হলো চাকা সুদ্ধ কামরার নিচের অংশটি, যেটি কামরাকে রেললাইনে বসায় ও ট্রেনকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে সক্ষম করে। কলকাতা মেট্রো যেহেতু ভারতীয় রেলের তত্যাবধানে তৈরি হচ্ছিল, তাই

মেট্রোর ব্রড গেজ বগি ছবি - অর্কোপল সরকার

সেখানে চিরাচরিত ভারতীয় রেলওয়ের গেজ অর্থাৎ ব্রডগেজ ব্যবহার করা হয়েছিল। ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি তাই ব্রডগেজ কোচের বগিকে ভিত্তি করেই নকশা তৈরি করলো। কিন্তু এরপর প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো শেল বা কামরার খোল। ব্রডগেজ শেল কলকাতা মেট্রোর সুড়ঙ্গ ও বিভিন্ন স্টেশনের আয়তন ও নকশার সঙ্গে খাপ খেলনা। ICF পড়লো মহা ফাঁপরে, এবং কোচের নকশা প্রস্তুতিতে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হলো। অবশেষে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভাবনার পর ঠিক হলো, শেলটি হবে মিটারগেজ কোচের আদলে। তৎকালীন ICF- এর হাতে থাকা দুই সফল প্রযুক্তির অভাবনীয় সম্মেলন, যা সত্যি করেছিল এক নতুন যুগের সূচনা।

প্রথম পর্যায়ে ৯টি রেকের বরাত দিয়েছিলেন মেট্রো কতৃপক্ষ। এই রেকগুলির বৈদ্যুতিক সামগ্রী সরবরাহ করেছিল BHEL। এই রেকগুলি সবকটি প্রথমে চার কামরার ট্রেন হিসেবে পরিষেবা দিত, পরে ভিড় সামাল দিতে আট কোচের ট্রেন হিসেবে চলতে শুরু করে। এই আটটি কোচের মধ্যে ছয়টি ছিল মোটর কোচ অর্থাৎ যেগুলোতে মোটর রয়েছে নিজেই চলতে সক্ষম ও দুটি ট্রেলার কোচ অর্থাৎ যেগুলির নিজে চলাচল করতে অক্ষম। দুই প্রান্তের দুই কোচে ছিল ড্রাইভার ও গার্ড কেবিন। এখানেই ট্রেন চালনার যাবতীয় বন্দোবস্ত ছিল।

একটি ট্রেনের মূল চালিকাশক্তি হলো তার ইঞ্জিন এবং মোটর। যেহেতু এটি একটি EMU বা বৈদ্যুতিক ট্রেনসেট, তাই ইঞ্জিনের বদলে থাকতো ট্রান্সফরমার, রেক্টিফাইয়ার ও বিভিন্ন যন্ত্র যা দিয়ে মোটর এর দরকার অনুযায়ী বিদ্যুত ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া যায়।

মেট্রোর মিটারগেজ বগি ছবি - অর্কোপল সরকার

থার্ড রেল কানেক্টর ছবি - অর্কোপল সরকার

ট্রেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ভারতে প্রথমবার ব্যবহার হলো থার্ড রেল প্রযুক্তি। এই থার্ড রেল প্রযুক্তি তে দুটি রেলওয়ে ট্র্যাক বা লাইন ছাড়াও আরেকটি অতিরিক্ত রেল থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্যে। সাধারণত: এই বিদ্যুৎসরবরাহকারী রেলের উপর আরেকটি সুরক্ষা প্রদানকারী লোহার পাত লাগানো থাকে। কলকাতা মেট্রোর ক্ষেত্রে থার্ড রেলে ৭৫০ ভোল্ট ডিসি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, ট্রেন চালানোর উদ্দেশ্যে। রেকের নিচভাগে প্রত্যেক কোচে দুটি করে কালেক্টর প্লেট লাগানো থাকে, যার মাধ্যমে রেকটি থার্ড রেল থেকে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে। কলকাতা মেট্রো রেলে Bottom-Collector প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ প্লেট গুলি থার্ড রেলের নিচ ভাগে স্পর্শ করে থেকে বিদ্যুৎ সংগৃহিত করে।

এই বিদ্যুৎ যখন রেকের ভিতর প্রবেশ করে, তখন ট্রান্সফর্মার এর দ্বারা তাকে ব্যবহার যোগ্য বিদ্যুতে পরিবর্তন করতে হয়। এই পরিবর্তিত বিদ্যুৎই রেকগুলিকে নিজের গতিতে ছুটে চলতে সাহায্য করে; অর্থাৎ ট্র্যাকশন মোটরগুলিতে সেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। BHEL ও NGEF দুটি রেকে মোটর গুলির আয়তন ও বৈশিষ্ট্য আলাদা হলেও, প্রযুক্তি ছিল এক - ডিসি সিরিজ মোটর। পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স ও সফটওয়ার এর প্রচলন না হওয়ায়, ডিসি মোটর ছিল সবচেয়ে সহজলভ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত। Axle-hung ট্র্যাকশন মোটর গুলি ডিসি ভোল্টেজ নিয়ে রোটরের সাহায্যে চাকাকে ঘোরায় ও এগিয়ে নিয়ে যায়। BHEL রেক গুলির তুলনায় NGEF রেকের মোটর গুলির আয়তন ও উৎপাদিত শক্তি দুই বেশি ছিল।

NGEF এর তৈরী রেক ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

*Axle-hung যন্ত্রপাতি* *ছবি - অর্কোপল সরকার*

*BHEL এর তৈরী রেক* *ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী*

এই ট্রাকশন মোটরকে সঠিক ভোল্টেজ দেওয়ার জন্য ট্রান্সফর্মার ও ট্যাপ চেঞ্জার ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সফর্মারের এক দিকে ৭৫০ ভোল্ট ডিসি থাকে ও অপরদিকে মোটর এর দরকার মতো ভোল্টেজ নিয়ে নেওয়া হয়। এই কাজেই নিযুক্ত থাকে ট্যাপ চেঞ্জার, যা রেকটির গতি নিয়ন্ত্রণে মূল স্তম্ভ। মোটরমান কেবিন থেকে ট্রাকশন হ্যান্ডল ঘুরিয়ে যেমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন, তেমনভাবেই ট্যাপ চেঞ্জার: ট্রান্সফরমারের Secondary Windingএ নানা জায়গায় খাঁজ বসিয়ে বা Tap করে মোটরের ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে। মোটর এর ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ এর সাথে সাথেই উৎপাদিত অশ্বশক্তি ও Torque নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ করা যায়।

এ ছাড়াও ব্রেকিং এর জন্য ব্যবহার হয়েছে প্রচলিত এয়ার ব্রেক। কম্প্রেসরের সাহায্যে ব্রেক প্রেশার তৈরি করা হয়। এই কম্প্রেসার এর জন্য 3-phase AC বিদ্যুৎ দরকার পড়ে। তাই এই বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য একটি কনভার্টার বা বিদ্যুৎ পরিবর্তনকারী যন্ত্রের ব্যবহার করা হতো। যেহেতু তখনো পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্সের আবির্ভাব হয়নি, তাই একটি মোটরকেই generator হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যার প্রযুক্তিগত নাম Arno Converter।

কোচের ভিতরে ছিল যাত্রীদের বসার ও দাঁড়ানোর সুবৃহৎ জায়গা। সাধারণত দুই রকমের রেকেই লম্বালম্বি বসার আসন ছিল। সিটগুলি প্লাস্টিক ও ফাইবার এর তৈরি ছিল। BHEL রেকগুলিতে কিছু কামরায় লোকাল EMU ট্রেনের মতোই মুখোমুখি আসন ছিল কিন্তু পরে সেগুলিকে প্রচলিত রূপেই ফিরিয়ে আনা হয়। সব মিলিয়ে আট কোচের রেক গুলিতে ২৪০০ মানুষের বহনক্ষমতা ছিল। কামরাতে হাওয়া চলাচল ও কলকাতার আর্দ্র আবহাওয়ায় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বিশেষ ধরণের ফ্যান। সেই ফ্যান টানেলের ভিতরের হাওয়া পরিশুদ্ধ করে কামরায় চলাচল করতে সাহায্য করত। Force-Ventilated ট্রেনগুলি অফিসের ব্যস্ত সময়ের যাত্রাকে করে তুলতো আরামদায়ক।

যাত্রীদের ঘোষণা ও তথ্য দেওয়ার জন্য ছিল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র PIS বা Passenger Information System। প্রত্যেক কোচে লাগানো ছিল স্পিকার যার মাধ্যমে বর্তমান ও পরবর্তী স্টেশন সম্বন্ধে ঘোষণা চলতো। মোটরম্যানকে কোন জরুরি ঘোষণা বা অভিবাদন জানাতে হলেও এটির সাহায্য নিতেন। দরজায় ছিল অটোমেটিক ডোর বা স্বয়ংক্রিয় দরজা যা hydraulic চাপের দ্বারা খোলা বন্ধ হতো। ভারতবর্ষে প্রথমবার এই প্রযুক্তি কলকাতা মেট্রোতেই দেখা গিয়েছিল ও মানুষ হয়েছিল অভিভূত। ট্রেনের গার্ড স্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামা হওয়ার পর, সঙ্কেত হিসেবে একটি ঘন্টি বাজান, যা মোটরম্যান শুনে তাঁর কাছে থাকা সুইচ টিপে দরজা বন্ধ করেন। তারপর আরেকবার সংকেত দিয়ে ট্রেন স্টেশন ছাড়ে। প্রত্যেক কোচে চালকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চারটি করে আপদকালীন যন্ত্র থাকতো। মেট্রো রেকগুলি যাত্রীদের জন্য যেমন ছিল আরামদায়ক, সুগম তেমনই মোটরম্যান বা গার্ডের জন্য কেবিনগুলো ছিল যথেষ্ট বড়, আরামদায়ক ও প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত।

২০০৯ সাল। কলকাতা মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ শাখায় এক নতুন যুগ উন্মোচিত হলো। দক্ষিনদিকে ৮.৬ কিমি প্রসারিত হয়ে কবি নজরুল (গড়িয়া বাজার) অবধি মেট্রো

*নন-এসি BHEL রেকের অন্দরমহল* *ছবি - অনমিত্র বোস*

*নন-এসি মেট্রোর মোটরম্যান কেবিন* *ছবি - অনমিত্র বোস*

*BHEL ও Knor Bremse নির্মিত এসি রেক* *ছবি - অনমিত্র বোস*

*Texmaco দ্বারা পুনর্নির্মিত NGEF রেকগুলি* *ছবি - অর্কোপল সরকার*

চলাচল শুরু হলো। এর সাথে অবশেষে কলকাতা মেট্রোয় এলো এসি মেট্রোর যুগ, ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (ICF), জার্মানির Knor Bremse ও BHEL এর যৌথ উদ্যোগে এলো দুটি এসি রেক। কিন্তু এই সম্প্রসারণের ফলে যাত্রীসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলো, ফলে বয়স পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ নন-এসি রেকগুলি জোরকদমে পরিষেবা দিতে থাকলো, শুধুমাত্র কিছু যন্ত্রাংশ রক্ষনাবেক্ষন করেই। এর সাথেই যোগ হলো নতুন এসি রেকগুলির নিত্যনতুন সমস্যা। নকশার ত্রুটির ফলে নানা সময়েই ব্যস্ত অফিস টাইমে যাত্রীদের হয়রানির কারণ হতো। এর ফলে পুরোনো রেকগুলি অবসর গ্রহণের বদলে আরো নতুন উদ্যমে কাজ করতে বাধ্য হলো। সেখানেও অতি প্রাচীন BHEL রেকগুলি বয়সের ভারে আস্তে আস্তে বসে যেতে লাগলো। দুর্গোৎসবের জনসমাগম হোক বা ব্যস্ত অফিসের দিনগুলি -- গুটিকয়েক এসি রেকের সঙ্গে মূলত এই বৃদ্ধ রেকগুলি হয়ে উঠেছিল কলকাতার মানুষের সম্বল। এরপর ধীরে ধীরে পরের ছয় বছরে আরো ১১টি এসি রেক পরিষেবার দিতে আরম্ভ করে। এরপরে ২০১৭ সাল নাগাদ কলকাতা মেট্রোয় লাগলো আধুনিকতার ছোঁয়া। এলো ঝাঁ চকচকে নতুন রেক। আবার সেই ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি - তবে এবার প্রযুক্তি অনেকটাই আলাদা, ডিসি মোটরের বদলে এসি মোটর ও অনেকটাই সফটওয়ার-ভিত্তিক। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী সংস্থার নামানুসারে নাম হলো মেধা মেট্রো। কিন্তু পুরোনো অসুখ আবার প্রকট হলো -- দু বছরের চেষ্টাতেও ঝাঁ চকচকে রেকগুলি নামতে পারলো না যাত্রী পরিষেবায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, এই বৃদ্ধ রেকগুলিকে আরেকবার কর্মজীবনের আরো কিছু বছর বাড়িয়ে তোলা হবে। এর দায়িত্ব দেওয়া হলো টেক্সমাকোকে (Texmaco)। ধীরে ধীরে সব নন-এসি রেককেই নতুন জীবনের ছোঁয়া দেবার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। মাত্র ৩টি রেক

*ICF নির্মিত মেধা রেক* *ছবি - অনমিত্র বোস*

রেক নতুনভাবে তৈরী করা হয়েছিল। তারমধ্যেই দেখা যায় মেধা রেকগুলি প্রযুক্তিগত সমস্যা মিটিয়ে খুব শিগগিরই এখানকার ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এবং কলকাতা মেট্রোর ইঞ্জিনিয়ারদের রিপোর্ট অনুযায়ী ICF সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি কাটিয়ে উঠে বিশ্বমানে রেক সরবরাহ করতে শুরু করে দেয়। এবং কোভিড অতিমারির আগেই ১৪টি রেক সফল ভাবে পরিষেবার কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়। ফলে নন-এসি রেকের বিদায় ঘন্টা বেজে যায়।

এদিকে ২০১৭ নাগাদ, তীব্র রেক সংকট চলাকালীন রেলবোর্ড এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছিল - তারা ১৪টি নতুন রেক আনার জন্য ওপেন টেন্ডার প্রকাশ করলো। এতদিন কলকাতা মেট্রোয় ICF এর আধিপত্যের মাঝে এ ছিল এক নতুন হাওয়া। টেন্ডার প্রক্রিয়ার ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা গেলো নতুন রেকের বরাত পেয়েছে চিনা রেলের অধীনস্থ CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation) 'র ডালিয়ান শহরের ফ্যাক্টরীটি। এই রেকগুলি অত্যাধুনিক এবং ভারতের অন্যান্য মেট্রোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো। ২০১৯ সালে সমুদ্রপথে কলকাতা বন্দরে এসে ভিড়ল একটি চিনা জাহাজ যাতে ছিল প্রথম চিনা Dalian রেক। এরপরে দীর্ঘ ৪ বছরের অপেক্ষা। Covid অতিমারি, কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি নানা কারণে Dalian রেকটিকে বের করা যায়নি যাত্রী পরিষেবায়। মাঝে মাঝেই যাত্রী পরিষেবা বন্ধ হওয়ার পর Dalian রেকটি শুরু করতো তার পরীক্ষামূলক দৌড়। প্রযুক্তিগত ভাবে রেকটি আধুনিক, 3-phase মোটর দ্বারা চালিত ও বৈদ্যুতিক সামগ্রীগুলি মূলত Toshiba'র সরবরাহ করা। এছাড়াও Regenerative ব্রেকিং থাকার ফলে অনেকাংশে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। CBTC

*CRRC ডালিয়ান নির্মিত রেক* *ছবি - অর্কোপল সরকার*

ডালিয়ান রেকের অন্দরমহল — ছবি - অনমিত্র বোস

শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন — ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

সিগন্যালের উপযুক্ত এই রেক। যাত্রী স্বচ্ছন্দের দিকেও নজর দিয়ে আরামদায়ক ফাইবার সিট, চওড়া ভেস্টিবিউল, শক্তিশালী বাতানুকুলীন ব্যবস্থা ও কনিকাল রবার স্প্রিং সাসপেনশন। অবশেষে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে যাত্রী পরিষেবা শুরু করে এই চিনা রেক।

কলকাতা মেট্রোর একমাত্র স্ট্যান্ডার্ড গেজ লাইনে হলো ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো বা গ্রীন লাইন। বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শুরু করে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ অবধি যাত্রী পরিষেবা দেয় এই অত্যাধুনিক মেট্রো লাইন। এই লাইনে যাত্রীদের পরিবহন করে ভারতে তৈরি BEML রেক। BEML বা Bharat Earth Movers Ltd ভারত সরকারের অধীনে থাকা একটি নবরত্ন PSU, যার ফ্যাক্টরি ও অফিস ব্যাঙ্গালোরে। BEML এর আগে দিল্লি, জয়পুর ও ব্যাঙ্গালোর মেট্রোর রেক সরবরাহ করেছে। ফলে তারা মেট্রো কোচ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ একটি সংস্থা হয়ে উঠেছে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো লাইনটি স্ট্যান্ডার্ড গেজ ও থার্ড লাইন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা থাকায় রেকগুলি ব্যাঙ্গালোর মেট্রোর সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। রেকগুলোর কোচগুলির নকশা Hyundai Rotem এর এবং বৈদ্যুতিন সামগ্রী সরবরাহ করেছে MELCO বা Mitsubishi Electrical Compan। রেকগুলি প্রথম থেকেই অসামান্য পরিষেবা দিয়ে মানুষকে তাক লাগিয়েছে। ইস্ট-ওয়েস্ট লাইনে সিগন্যালিং ব্যবস্থা রয়েছে HITACHI ও ANSALDO STS এর CBTC সিগন্যালিং সিস্টেম। এছাড়াও লাইনটি প্রতিটি স্টেশনে রয়েছে পূর্ণ বা অর্ধ আকারের প্ল্যাটফর্ম স্ক্রিন ডোর যা শুধুমাত্র ট্রেন আসলে তবেই খোলে। অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কিছু মানুষের আত্মহত্যার ঘটনায় তিতিবিরক্ত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকলেও একমাত্র এই লাইন বাদে শহরের নির্মীয়মাণ আর কোনো মেট্রোতেই, প্রযুক্তিগত জটিলতার কারণে, স্ক্রিন ডোর বসানো হচ্ছে না। এদিকে, জানা গেছে যে ইস্ট-ওয়েস্ট লাইনের বাকি অংশে খুব শীঘ্রই হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেডের মধ্যে পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হবে। ফলে এটি হবে ভারতের সর্বপ্রথম নদীর তলা দিয়ে মেট্রো যাত্রা। এই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের অন্যতম কঠিন ও বিপজ্জনক অংশ হলো বৌবাজার। ঘন ঘন ধস ও আলগা মাটির কারণে বহুবার যেখানে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে নির্মাণকারী সংস্থাকে। সন্তর্পনে ও সুচিন্তিত পদক্ষেপে কাজ শেষ করে পুরো সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মেট্রো যাত্রার অধীর অপেক্ষায় কলকাতাবাসী।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর BEML নির্মিত রেক — ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

কালের নিয়ম সবার জন্য এক- মানুষ হোক বা যন্ত্র। বিশ্বজুড়ে কোভিড মহামারীর কারণে কলকাতা মেট্রোও প্রথমবার দীর্ঘদিনের জন্য সাধারণের জন্য রুদ্ধ রইলো। এবং তারই মধ্যে সব মিলিয়ে ১৮টি মেধা রেকের যাত্রী পরিষেবায় সফল অন্তর্ভুক্তি ঘটে। যার ফলে এসি রেকের মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩১শে। ফলস্বরূপ, নন-এসি রেকের অন্তিম বিদায়পর্ব শুরু হয়ে যায়। শেষবার দেখা গেল, যখন উত্তর দিকে দক্ষিণেশ্বর অবধি মেট্রোর ট্রায়াল শুরু হলো ও সগর্বে ছুটতে দেখা গেল কলকাতা মেট্রোর সেই বৃদ্ধ সৈনিককে। সেটিই যেন ছিল তার শেষবার্তা -- সঁপে দিয়ে গেল এই গুরুদায়িত্ব তার উত্তরসূরীদের হাতে। হয়তো আমরা আর শুনতে পাবো না সুড়ঙ্গে নন-এসি মেট্রোর মোটরের মধুর আওয়াজ, কিংবা অষ্টমীর সন্ধেয় কালীঘাট স্টেশনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের ঠাকুর দেখাকে আরো সুগম করে তোলা; কিন্তু মনের মণিকোঠায় রয়ে যাবে সেই ছোটবেলার ও বেড়ে ওঠার নিত্যসঙ্গী এই ঐতিহাসিক : কলকাতা মেট্রোর নন-এসি রেক।

বিদায়বেলার কিছু মুহূর্ত — ছবি - অনমিত্র বোস

# ডাইনিং কার

## সৌমিত্র পাল

ছোটবেলায় ছুটি পড়লেই বাবা মায়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়তাম। কখনও দেশের উত্তরে কখনও পশ্চিম বা দক্ষিণে। এই সব সফর অবশ্যই ট্রেনে। নতুন জায়গা - ইতিহাস, ভূগোলে পড়েছি - দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। সফরসূচী চুড়ান্ত হওয়ার পর চড়ত উত্তেজনার পারদ। টিকিট কাটামাত্র তোড়জোড় শুরু। হোল্ডঅল নামানো গোছানো, ট্রাংক, বাক্স প্যাটরা বাঁধা। তারপর নির্দিষ্ট দিনে ট্যাক্সিতে হাওড়া স্টেশন। স্টেশনে পৌছে দেখতাম সবাই ব্যস্ত, ছুটছে। মনে হত এই বুঝি ট্রেন ছেড়ে দেবে। দু'ভাই লাগাতাম দৌড়। তখনও ষাটের দশক শেষ হয়নি। সেটা বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যুগ। প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেই ধোঁয়ার গন্ধ এনে দিত এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। নিদিষ্ট সংরক্ষিত কামরায় পৌছে, সংরক্ষণ তালিকায় নাম

মিলিয়ে, যথাযথ আসন গ্রহন; সেটা দেড়-দু দিনের নিশ্চিন্ত আস্তানা। মা মালপত্র গুছিয়ে রাখতেন। বাবা ততক্ষনে A. H. Wheeler এর বইয়ের দোকানে হাজির। একটু পরে আমাদের হাতে উপহার ছোটদের উপযোগী বই। খোঁজ নিতেন ট্রেনে 'ডাইনিং কার' – Dining Car - আছে কিনা, থাকলে আহার সেখানে। তখন আনন্দের সীমা থাকত না। ছুটিতে সে এক উপরি পাওনা। বেড়ানো ছিল বরাবরের নেশা। আর বৈচিত্রে ভরা রেল ভ্রমণ দিত বাড়তি আনন্দ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম বিশালাকায় বাষ্পীয় ইঞ্জিনটির দিকে। চালকেরা আদায় করে নিত সম্ভ্রম। অবাক দৃষ্টিতে দেখতাম Lever টেনে Semaphore Signal এর ওঠা নামা। ঘন্টার আওয়াজ বুঝিয়ে দিত আগত ট্রেনের অবস্থান। কাঠের আসবাবে সাজানো Retiring Room ছিল নিশ্চিন্ত আরামের ঠিকানা। আর চলন্ত ট্রেনে 'ডাইনিং কার' এ আহার ছিল সামান্য মূল্যে বিলাসিতা। এক কথায় ধীরগতি হলেও সেকালের রেলযাত্রা দিত এক নির্মল আনন্দ।

এই লেখার আলোচ্য বিষয় 'ডাইনিং কার'। এর অবস্থান থাকত রেলগাড়ীর মাঝখানে। তখন আয়তনে যাত্রীট্রেন এখানকার মত লম্বা হত না। বড়জোড় দশ এগারোটা কামরা। গুটিকয়েক ট্রেন ছাড়া অধিকাংশ ট্রেনে vestibule ছিল না। স্টেশনে দাঁড়ালেই

'ডাইনিং কার'এ যাওয়া যেত। এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে যাত্রা লম্বা দৌড় হলে 'ডাইনিং কার'এ যাওয়ার জন্য যাত্রী সুবিধার্থে TTE জানিয়ে দিত unscheduled stop এর সময়। এক কামরার আলো ঝলমলে এই 'ডাইনিং কারের' মাঝখানে থাকত চলার জায়গা। দুপাশে জানালা সংলগ্ন ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা দু'ভাগে ভাগ করা ১০/১২ টি টেবিল। প্রতি টেবিলে চারটি করে আসন। এক পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকত মধ্যাহ্নভোজ, নৈশাহার, হাল্কা খাবার, চা, কফির আয়োজন। চলমান এই রেস্তোরীর কৌলিন্যের কোনও জুড়ি ছিল না। 'ডাইনিং কার' যুক্ত ট্রেনের মর্যাদাই ছিল আলাদা। আসন গ্রহন করলে হাজির হত uniform পরা steward, waiter। মেনু কার্ডে দেখে খাবারের অর্ডার। রান্না হত 'ডাইনিং কারের' রান্নাঘরে। তারপর প্রতীক্ষা। জানালা দিয়ে চোখ চলে যেত বাইরে। একের পর এক জনপদ, গ্রাম পেরিয়ে ট্রেন ছুটে চলত তার গন্তব্যে। মনে গেঁথে যেত সবুজ প্রান্তর, পাহাড়, নদী, - এক টুকরো ভারতের বৈচিত্রের ছবি। ট্রেনের দুলিনি, উড়ে আসা কয়লার টুকরো, ইঞ্জিনের হুইশেল, বাবা মায়ের খাবার গল্প – এরই মধ্যে খাবার পরিবেশন। কাটা, চামচ, গ্লাস, প্লেটের টুং টাং আওয়াজ। চলত ভোজ। Steward এসে খাবারের মান সম্পর্কে খোঁজ নিত। সব কিছুই নিখুঁত। সে এক রাজকীয় ব্যাপার। এর কাছে হার মানত শহরের সব তারকা খচিত রেস্তোরাঁ। তখন সাধারন রেলযাত্রাও হয়ে উঠত অসাধারন। খাওয়া শেষ হলে বিল মেটানো। অন্যদের জায়গা করে দেওয়া। দীর্ঘ যাত্রায় 'ডাইনিং কার'এ খাওয়া ছিল একটা ব্যতিক্রম। একঘেয়েমিতে টানত ছেদ। আজও মনে পড়ে কোন এক মেল ট্রেনে হাওড়া থেকে খড়গপুরের পথে এক স্বল্প সফরেও 'ডাইনিং কার' এ ভোজ।

১৯৬০ এর মাঝামাঝি ডিজেল ও বিদ্যুতায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল ট্রেনের আয়তন। ৮-১০ কামরার ট্রেন হল ২২ - ২৪ কামরার। যাত্রী চাপে 'ডাইনিং কার' হল সেকেলে; অতএব বিদায়। এক অধ্যায়ের অবসান। Pantry Car - যাত্রী আসনেই খাওয়া পৌঁছানোর ব্যবস্থা।

আজ "ডাইনিং কার" এক ইতিহাস। যা ছিল এক সময় আপামর যাত্রী নাগালে, তাকে আজ পাওয়া যাবে রেল মিউজিয়ামে বা 'Palace on Wheels' বা 'Deccan Queen' এ বা গল্পে। তবে সে কোন কাল্পনিক গল্প নয়, তা কিন্তু সত্যি।

---

কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী সৌমিত্র পাল একজন আদ্যন্ত রেলপ্রেমী মানুষ। রেল নিয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজেও উনি বর্তমানে যুক্ত আছেন। ওনার লেখনী এবং প্রেরণা রেল ক্যানভাস পরিবারকে সমৃদ্ধ করেছে।

সমস্ত চিত্র প্রতীকি এবং ইন্টারনেট থেকে গৃহীত।

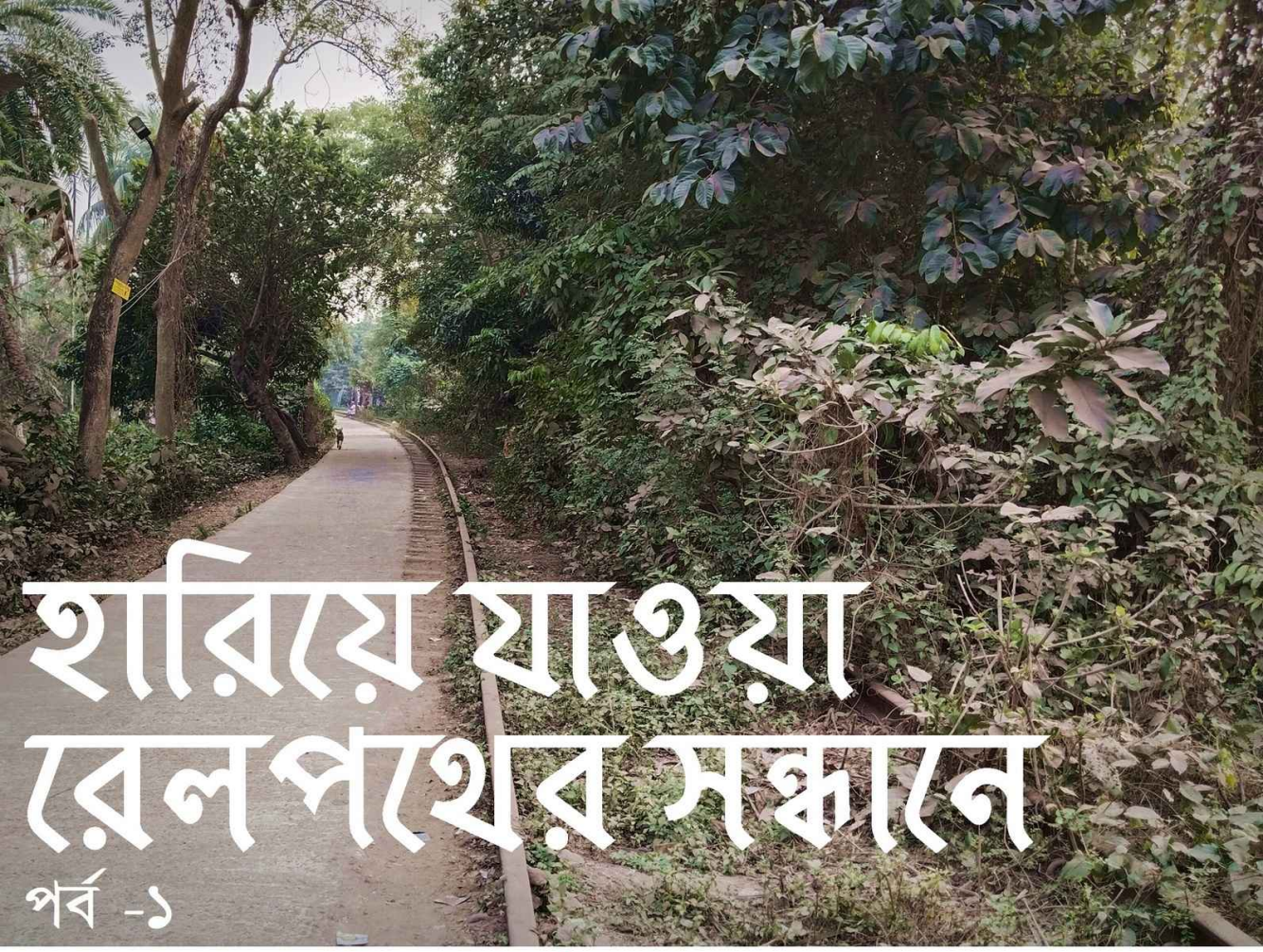

# হারিয়ে যাওয়া রেলপথের সন্ধানে

পর্ব -১

অর্কোপল সরকার

ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে শুরু করে ও বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অবধিও বাংলার শিল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল পাটশিল্প। ১৮৫৫ সালে জর্জ অকল্যান্ড প্রথম রিষরায় একটি পাটকল প্রতিস্থাপন করেন, তারপরে বাড়তে বাড়তে তা ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) পর্যন্ত। যার সংখ্যা ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে প্রায় ১১০ এর বেশি ছড়িয়ে যায়। ভারতের জুটমিলের বেশিরভাগটাই পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ও হাওড়া জেলা জুড়েই ভারতের বর্তমানে চালু ৯৪টি জুটমিলের মধ্যে ৭০টি জুটমিল বর্তমানে অবস্থিত। আর্থিক মন্দা, দেশভাগ ইত্যাদি এই শিল্পের বহু ক্ষতিসাধন করেছিল। পরবর্তী সময়ে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার, জুটমিল গুলোর প্রশাসনিক অবক্ষয়, কাঁচামালের যোগান ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলস্বরূপ আমরা এখনো হুগলি নদীর দুই তীর জুড়ে সারি সারি বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত জুটমিল দেখতে পাই।

এই কারখানাগুলোর কাঁচামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতো রেলপথ ও জলপথ। এই কারনেই এখনো হুগলী নদীর দুই তীর দিয়ে চলা পূর্ব রেল ও দক্ষিন-পূর্ব রেলের শহরতলী শাখার রেলপথের বহু ষ্টেশন থেকে বেরোতে বা তার আশেপাশের বহু জায়গায় পরিত্যাক্ত রেলপথের সন্ধান মেলে, যার কোন কোনটার কিছুটা অংশ এখনো রেল রেখে দিয়েছে নিজস্ব সান্টিং এর কাজে আর বাকিটার উপরে গজিয়ে উঠেছে, বাড়ি দোকান পাট, বা কোনটার ট্র্যাক বেডটা পরিণত হয়েছে নতুন রাস্তায়। আজ সেরকমই এক রেলপথের গল্প বলবো।

আমরা যারা দক্ষিন-পূর্ব রেলপথের শহরতলীর বিভিন্ন ষ্টেশনে যাতায়াত যাতায়াত করি তারা লক্ষ করেছি বাউরিয়াকে জংশন রূপে উল্লেখ করা হয় টিকিটে কিন্তু খালি চোখে কিন্তু বাউরিয়া থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া কোন রেলপথই চোখে পড়ে না। তাহলে বাউরিয়া কেন জংশন ?? সেটি খুঁজে দেখতেই

এপ্রিলের এক বিকেলে আমরা হাজির হয়েছিলাম বাউরিয়া ষ্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে খড়গপুরের দিকে লাইন ধরে একটু হাঁটলেই দেখতে পাওয়া যায় যে একটি লাইন কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে হুগলী নদীর দিকে চলে গেছে। সেটি ধরে আমরা হাটা শুরু করলাম। রেলপথটির প্রথম অংশ দেখলে মনে হবে যে সেটা চালু রয়েছে ও তাতে ইলেকট্রিকের কাজ ও শুরু হয়েছে। প্রায় ২০০ মিটার মতো সেই কাজ হচ্ছে এবং যেখানে গিয়ে সেই কাজের শেষ পোল দুটো রাখা হয়েছে তার পর থেকেই লাইনটা পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তাতে প্রায় মাটিতে মিশে গেলেও এখনো খুঁজে পাওয়া যায় রেলের সেই আমলের লোহার স্লিপার, পুরনো সুরকির ব্রিজ ইত্যাদি। আরো কিছুটা এগোতেই লাইনটি সমাপ্ত হয় কিন্তু একদম সেই বরাবর একটা রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে। সেই পথ ধরে আর ১৫০ মিটার মতো এগিয়ে যেতেই রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। সেই অংশটি

সেই অংশটি দেখলে খালি চোখে অনুমান করা যেতে পারে সেখানে একটি জংশন পয়েন্ট ছিল। অর্থাৎ হুগলীর তীর থেকে দুটি লাইন এসে মিশত। আমরা প্রথমে চললাম বাঁদিকের বেঁকে যাওয়া রেলপথ বরাবর যেটা এখন একটি পুরোদস্তুর গলিতে

একটি পুরোদস্তুর গলিতে পরিণত। খানিক এগোতেই আবার পাওয়া গেল পরিত্যাক্ত রেলপথের অংশ, তা বরাবর সোজা এগোতেই তা গিয়ে পড়লো একটি বিস্তীর্ণ অংশে, দূরে হুগলী ও সামনে বিরাট এক মিল। এই মিলটি হল একসময়ের বিখ্যাত ফোর্ট গ্লস্টার জুট মিল।

১৮৭৯ সালে স্থাপিত ফোর্ট গ্লস্টার বাউরিয়া এলাকার সুবৃহৎ একটি জুট মিল ছিল যা পাটজাত দ্রব্য বানানো ও এক্সপোর্ট করতো। সেই কারখানার সমস্ত সামগ্রী আদান প্রদান এর জন্যই বাউরিয়া ষ্টেশন থেকে একটি রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল। কালের নিয়মে অন্যান্য জুটমিলের মতো এটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও বর্তমানে নাম পরিবর্তন করে ফোর্ট গ্লস্টার থেকে Gloster Limited রূপে চালু রয়েছে এবং তাতে রেল যোগাযোগ এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই ধীরে ধীরে পরিত্যাক্ত হয়েছে সেই রেলপথে ও ভূগর্ভের অন্তরালে ধীরে ধীরে চলে গেছে।

আমরা আবার ফিরে এলাম সেই জংশন পয়েন্টটিতে যেখান থেকে আরেকটি লাইন বেঁকে যায় ডানদিকে। সেই পথ বরাবর অল্প হাঁটতেই চোখে পড়বে এক সুবিশাল মাঠ যার পরেই বয়ে চলছে হুগলী নদী। মাঠটির পাশ বরাবর একটু হেঁটে যেতেই পড়বে পরিত্যাক্ত একটি বাড়ি তার ঠিক উল্টোদিকে অর্থাৎ যে রাস্তা ধরে আমরা মাঠ বরাবর হেঁটে এলাম তার বাঁ দিকে ছোট্ট একটি প্লাটফর্ম এর ভগ্নাংশ। জায়গাটার নাম ডিপুর মাঠ। নামটাই কেমন অদ্ভুত তাই না ??

আসলে ডিপো কথাটা থেকে অপভ্রংশ হয়ে ডিপু হয়ে গেছে। আর এই ডিপোটাই ছিল এই গোটা মাঠ জুড়ে। মোট ৮ থেকে ৯ টি লাইন পরিবেষ্টিত এই জায়গাটা থেকেই নদীপথে আসা

বিভিন্ন সামগ্রী মালগাড়ির মাধ্যমে পরিবহন করা হত। মাঠ বরাবর একটু এগোলেই নদী তীরবর্তী অঞ্চলে পৌঁছানো যায় যেখানে রেললাইনে ছোট ছোট খণ্ড বিখণ্ড অংশ এখনো বিদ্যমান। যদিও অধিকাংশ যন্ত্রাংশই অরক্ষিত থাকতে থাকতে গায়েব হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের ঘরঘর শব্দ বা মাল ওঠানামার কাজে একসময়ের সদাব্যস্ত অঞ্চলটি আজ বড়ই নির্জন।

ভগ্নপ্রায় প্লাটফর্ম ও গুদামঘরের অংশটুকু এখনো সেই সময়ের স্মৃতি চিহ্ন বয়ে বেড়ায়।

হাওড়া জেলায় এরকম শিল্পকেন্দ্রিক রেলপথ একসময়ে জ্বালের মতো ছড়িয়ে ছিল। এর প্রত্যেকটিই পণ্য পরিবহনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতো। বর্তমানে কারখানাগুলি তাদের পাট চুকিয়ে বিদায় নেওয়া কিংবা বিকল্প মাধ্যম খুঁজে নেওয়ায় রেলপথ গুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় তা হয়েছে একটি পাড়ার রাস্তা বা কোথাও কোথাও গজিয়ে ওঠা বাড়িঘরের মধ্যে দিয়েই তাদের যেতে দেখা গেছে। হাওড়া কলকাতার উত্তর ২৪ পরগনার এমনই আরো কিছু রেলপথের অনুসন্ধানে আছি আমরা, যার গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করবো পরবর্তী পর্বে।

*ব্যবহৃত সমস্ত ছবি আকাশ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত।*

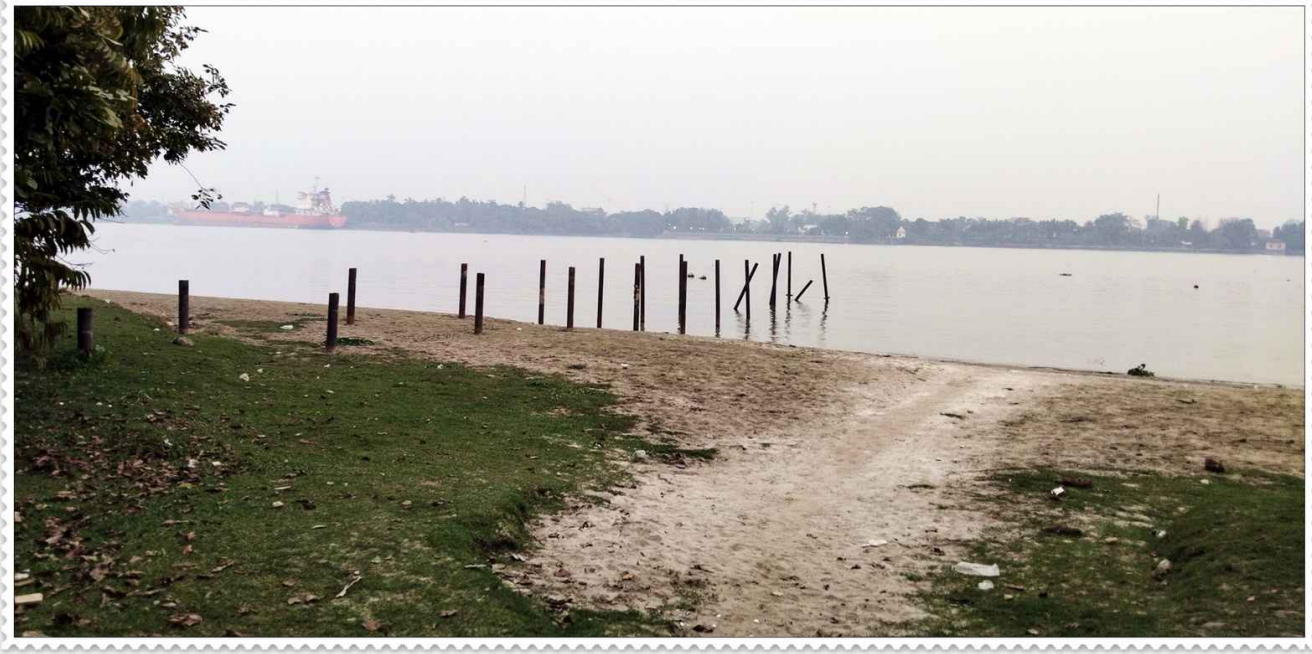

# কলকাতার ট্রামের কড়চা

## উদিত রঞ্জন গুপ্ত

সালটা ১৯৭৪, সবে মাত্র বাবা মায়ের সাথে বিলেতের পাঠ চুকিয়ে কলকাতা শহরে ফিরলাম। সাধের লন্ডন টিউব ট্রেনকে বিদায় দিয়ে ভারাক্রান্ত মন। আমার বয়স ৫, দমদম বিমানবন্দরে আত্মীয়স্বজনদের ভিড়, কিন্তু আমার মনে আনন্দ নেই, কারুর সাথে কথা বলার ইচ্ছে নেই। উত্তর কলকাতার হাতিবাগানে বাবা-কাকাদের বাড়ি, সেখানেই প্রথম দেখি ট্রাম; কৌতূহলবশতঃ ন'কাকুকে প্রশ্ন করতে তিনি যা উত্তর দিলেন, তাতে লন্ডনের টিউব আমার কাছে হঠাৎই তুচ্ছ হয়ে গেল। শুরু হলো আমার জীবনে ট্রাম যাত্রা। আজ অল্প কথায় জানাব কলকাতায় ট্রামের জন্ম সঙ্গে থাকল আমার ছোটবেলার ট্রামের স্মৃতিচারণ।

১৮৭৩ সালে প্রথম আর্মেনিয়া ঘাট থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ট্রাম চালু হয়। কিন্তু লোকসান বেশী হওয়াতে এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি নামে একটি লন্ডন ভিত্তিক কোম্পানি কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা শুরু করে। প্রথম দিকে ঘোড়া টানা ট্রাম ব্যবহার করা হত। একটা সময় ট্রাম কোম্পানিটির হাতে ১৭৭টি ট্রাম ও ১০০০ টি ঘোড়া ছিল। মাঝে অল্প কিছুদিন স্টিম ইঞ্জিনও ব্যবহৃত হয়েছিল ট্রাম চালানোর জন্য কিন্তু অতিরিক্ত যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্টিম ইঞ্জিন গুলি বাতিল করা হয়। ১৯০০ সালের শুরুতে ১৪৩৫ এমএম (৪ ফুট ৮.৫ ইঞ্চি) স্ট্যান্ডার্ড গেজের ট্রাম লাইন চালু হয়। ১৯০২ সালে ট্রাম পরিষেবার বৈদ্যুতীকরন শুরু হয়; যেটি ছিল এশিয়ার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম পরিষেবা। স্বাধীনতার কিছু পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা ট্রাম কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করে। বর্তমানে এটি ভারতের একমাত্র ট্রাম পরিষেবা। গত ১৫০ বছরে বহু প্রকারের ট্রাম মহানগরীর পথে চলেছে। A থেকে N ক্লাস অবধি তাদের শ্রেণীবিন্যাস। সঙ্গে ছিল কিছু PAYE শ্রেণীর ট্রামও।

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি ভর্তি হলাম Assembly of God Church School এ, কিন্ডারগার্ডেন শ্রেণীতে। শুরু হলো বাবার হাত ধরে স্কুল যাওয়া আর কলকাতা চেনা। লেক টাউন থেকে বাসে করে ধর্মতলা আর তারপর ২১, ২২ বা ২৫ নং ট্রামে রয়েড স্ট্রিট, আমার স্কুলে।

ফিরতাম একই ভাবে ন'কাকুর সাথে। কোনো কোনো সময় যাওয়া হত ঠাকুমার বাড়ি হাতিবাগানে। তখন ধর্মতলা থেকে চড়া হত ১ বা ৫ নং ট্রামে। সকালে ৭.১৫ মধ্যে ধর্মতলা পৌছতে পারলে ধরতে পারতাম ২২ নং Student Special ট্রাম, প্রথম শ্রেণী ছাত্র ছাত্রী দের জন্য। স্কুলে পড়তে প্রচুর K, L, M আর PAYE শ্রেণীর ট্রাম চরেছি। মাঝে মাঝে যাওয়া হত বেহালা, বড় জেঠুর বাড়ি, ৩৫ নং ট্রামে চড়ে দুরন্ত গতিতে, ময়দানের পাশ দিয়ে, কি অপুর্ব অনুভূতি লিখে বোঝানো যায় না। ১৯৭৯ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে যখন উঠলাম তখন দুপুর বেলায় স্কুলের পাঠ আরম্ভ হলো। সকালে একটু দেরি করে বাবা নিয়ে যেতেন

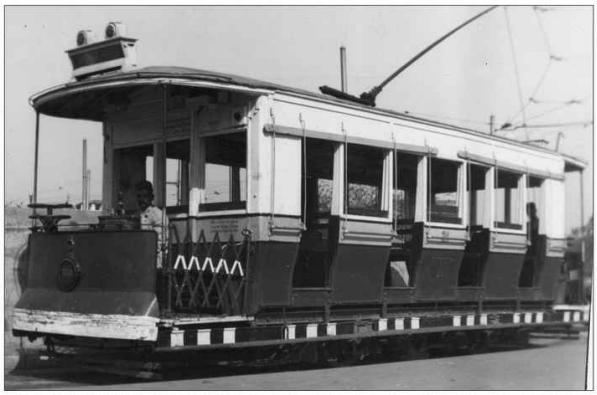

ধর্মতলা বাসে, তারপর M ক্লাস ১২এ ট্রামে চড়ে পার্ক স্ট্রিট হয়ে যেতাম বাবার অফিসে। ১১ টা নাগাদ হেটে চলে যেতাম কাছেই রয়েড স্ট্রিট এ। বিকেল বেলায় চলে আসতাম নোনাপুকুর মোড়ে। সেখান থেকে ১২ নং Student Special ট্রাম ধরে শিয়ালদহ স্টেশন হয়ে চলে যেতাম শ্যামবাজার। সেখান থেকে বাসে করে বাড়ি।

সেই সময় শিয়ালদহ উড়ালপুল তৈরী আরম্ভ হয়েছে। স্টেশনের কাছ দিয়ে লাইন পেতে ট্রামকে ঘুড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ফলে শিয়ালদহের লুপ বন্ধ হল আর বিপিন বিহারি গাঙ্গুলি স্ট্রিট দিয়ে ব্যাঙ্ক ওফ ইন্ডিয়া অবধি ১৪ নং ট্রাম চলা বন্ধ হলো। তারপর সূর্য সেন স্ট্রীট এ লাইন পেতে, আমহার্স্ট স্ট্রিট হয়ে সেই ট্রাম ডালহাউসি যেতে আরম্ভ করল। সাথে মহাত্মা গান্ধী রোড, সূর্য সেন স্ট্রীট এর সাথে যোগ হলো আর হাওড়া স্টেশনগামী ট্রামও ওইপথে চলতে আরম্ভ করলো। এরপর উড়ালপুল তৈরি হবার পর তার ওপর দিয়ে লাইন পাতা হলো আর ট্রাম চলতে আরম্ভ করলো।

তখন চলত ২৫০ থেকে ৩০০টি ট্রাম আর এখন চলে খুব বেশি হলে ২৫ থেকে ৩০টা, তাও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অনিহায় এবং অকর্মণ্য কলকাতা পুলিশের খামখেয়ালীপনায় মাঝে মধ্যেই সারা কলকাতায় বন্ধ থাকে ট্রাম পরিষেবা, না না উদ্ভট অজুহাতে। ট্রামের সার্ধশতবর্ষে সকল কলকাতাবাসিকে করজোড়ে আন্তরিক অনুরোধ, ট্রামকে কলকাতার রাস্তায় আবার তার স্বমহীমায় ফিরিয়ে আনত, CTUA অর্থাৎ ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগ দিয়ে, সরকারের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনায় বসতে সাহায্য করুন।

ব্যবহৃত সকল ছবি CTUA দ্বারা প্রেরিত ও স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত।

# রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

গত দেড়শো বছর ধরে কলকাতার রাজপথে ঘটে চলেছে এক অদ্ভুত ঘটনা। চলছে ট্রাম। অনেকের মনে হতেই পারে এ আর এমন কি কথা। কিন্তু আজ থেকে দেড়শো বছর আগে ব্যাপারটা কিন্তু শুধু অদ্ভুত নয় বরং আশ্চর্য্যজনক ছিল। তখনও মোটর-চালিত যুগ শুরু হয়নি। কলকাতার যানবাহন বলতে ভরসা শুধু পালকি অথবা ঘোড়া গাড়ি। ব্রিটিশ শাসিত দেশের তৎকালীন রাজধানীর জন্য একটি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল। কর্পোরেশনের কর্তারা প্রস্তাব দিলেন ১৮৭০ সালে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটা ট্রাম লাইন পাতা উচিৎ। বিস্তর নথিপত্র, আলাপ আলোচনার পালা পেড়িয়ে অবশেষে পরীক্ষামূলক ভাবে ট্রাম চালু হয়। তারিখটা বর্তমানে ট্রাম অনুরাগীদের সকলের জানা তাও উল্লেখ করতেই হচ্ছে। তবে, ১৮৭৩ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি কিন্তু নিছক ট্রাম চালুর দিন বলা ভুল হবে। বরং একটুও বাড়িয়ে না বলেও এটুকু ব্যক্ত করাই যায় যে ওইদিনটি কলকাতা তথা সমগ্র ভারতের প্রধান শহরগুলির সড়ক পরিবহণের ইতিহাসে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওইদিন কলকাতা তথা ভারত পেয়েছিল যুগোপযোগী, আধুনিক এবং দূষণহীন একটা পরিবহন ব্যবস্থা।

আমরা অনেকেই এটা জানি যে, সেই বছরেই নভেম্বর মাসে লোকসানের কারণে লাইনটি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এ ছিল ঝড়ের আগের স্তব্ধতা মাত্র। কারণ এর কিছু বছরের মধ্যেই আসতে চলেছিল ঝড়, ট্রাম-ঝড়! ইতিহাসের ভাষায় বললে - সে এলো, সে দেখলো, সে জয় করলো! ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসে আক্ষরিক অর্থে আবার কলকাতার বুকে আত্মপ্রকাশ করে ট্রাম। এবং তারপর থেকে শুধু অগ্রগতির ইতিহাস। ১৮৮৫ সালের মধ্যে দেখা যায় যে ১.৩ কোটি যাত্রী ট্রামে চড়ে ফেলেছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ, চিৎপুর থেকে কালীঘাট সবদিকেই শোনা যাচ্ছিল ট্রামের পদধ্বনি।

এখন শোনা যায় বিভিন্ন মেট্রোর লাইনের সম্প্রসারণের কারণে সেই অঞ্চলের জমিজমার দাম বাড়ছে, শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে ইত্যাদি। তখনও কিন্তু ঠিক একই জিনিষ ঘটেছিল, কিন্তু শুধুমাত্র ট্রামের জন্য। ট্রামের কারণেই আক্ষরিক অর্থে নগরায়ন ঘটেছিল শহর কলকাতার। একে মহানগরী বানিয়েছে এই শতাব্দী প্রাচীন ট্রাম। ট্রামের সম্প্রসারণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছিল কলকাতা শহরের পরিধি। সাহেব-মেম থেকে গরীব বা মধ্যবিত্ত সকলের ভরসা ছিল এই ট্রাম। এমনকি বর্তমানে ট্রামের সবচেয়ে বড় শত্রু যে কলকাতা পুলিশ, ১৯২০ সাল পর্যন্ত তাদেরও যেকোন দুর্ঘটনাস্থলে যোগাযোগের দ্রুততম মাধ্যম ছিল কেবলমাত্র ট্রাম। মানুষ যে সবচেয়ে বড় কৃতঘ্ন তার জ্বলন্ত উদাহরণ হল আজকের কলকাতা পুলিশ যারা এই ট্রামের অন্তর্জলি যাত্রার আয়োজন করতে উঠে পড়ে লেগে আছে।

১৮৯৫ সালে ১৯ মাইল রুট, ১৮৫টি ট্রামগাড়ি এবং ১০০০টি ঘোড়া থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ২৪০টি বৈদ্যুতিক মোটর কোচ এবং সমপরিমাণ ট্রেলার কোচ এবং প্রায় ৫০ মাইল রুট দ্বারা সমৃদ্ধ কলকাতার ট্রাম তখন একটি যুগান্তকারী পরিবহন মাধ্যম। দেশের অন্যত্রও ততদিনে ডানা মেলেছে ট্রামের উড়ান। বোম্বাই, দিল্লী, ম্যাদ্রাস, কানপুর, পাটনা, করাচি কোথায় ছিল না সে। পড়শী দেশ শ্রীলঙ্কার কলম্বোতেও দেখা গেছে ট্রামের দৃঢ় পদক্ষেপ। কবির কবিতায়, লেখকের রচনায়, পরিচালকের ক্যামেরায় বার বার ধরা পড়েছে মহানগরীর ট্রাম। এরকম নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব, দূষণহীন, সস্তা পরিবহন মাধ্যমের

বিকল্প না তখন ছিল না আজও আছে।

কিন্তু নৈঋত কোণে মেঘ জমতে দেখা দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই। মানুষে খাল কেটে কুমির নিয়ে আসে নিজের হাতে করে। আসে মোটর গাড়ির যুগ। বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দূষণ সমস্যার সূত্রপাত ওখানেই। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের নাভিশ্বাস তুলে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে সারা বিশ্বের মানুষ। ভারত তথা কলকাতাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অচিরাৎ দেখা গেল বাস-মোটরের ভিড়ে পরিবহণ ব্যবস্থাটাই কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে আরম্ভ করে। পরিবহণ সংস্থাগুলিও অদ্ভুত আচরণ করতে আরম্ভ করে যার উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য ১৯২০ সালে সিটিসির বাস সার্ভিস চালু করা। একটি ঐতিহাসিক ভুল পদক্ষেপ। যে সর্বনাশের বীজ সেই সময় বপণ করা হয়েছিল তা একটি আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত বৃক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৯২ সালে। ফের চালু হয় সিটিসির বাস পরিষেবা এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেদার দুর্নীতি। ট্রামের ন্যায্য পাওনা কেড়ে বাসকে দেওয়া থেকে শুরু করে হাজারো একটা অভিযোগ রয়েছে যেগুলো আম জনতা জেনেও না জানার ভান করে থাকে। যারফলে দুর্নীতিগ্রস্তদের সাহস আরো বেড়ে যায়।

আবারো যদি একটু পিছিয়ে যাই, দেখা যাবে যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বিভিন্ন বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সির দাপটে ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলো ট্রাম। দরকার ছিল এক সাহসী পদক্ষেপ, যা নেওয়া হলে এই বহু পরীক্ষিত এবং দূষণহীন পরিবহণ মাধ্যমকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে পারা যেত। কিন্তু তা হয় নি, বা বলা ভালো যে রাজনীতির কারবারীরা সেটা করতে দেয়নি। প্রথমে অত্যধিক এবং অপরিকল্পিত ভাবে যানবাহন বৃদ্ধি, যা রাস্তার অনুপাতে আশঙ্কাজনক ভাবে বেশী; তারপরে স্বাধীনতার পর থেকেই সরকারী স্তরে ট্রাম নিয়ে চরম উদাসীনতা; এবং এর সঙ্গে ৭১ সালে যুদ্ধের আবহে অসংখ্য শরণার্থীর আগমণ এবং কলকাতার তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার চূড়ান্ত অবক্ষয়; এই ত্রিফলার আঘাত সরাসরি গিয়ে পড়ে ট্রামের ওপর। উপর্যপুরি রুট বন্ধ করা, পরিকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার না হওয়া, লোডশেডিং এবং ভারতের প্রথম মেট্রোর কাজ সব মিলিয়ে ট্রামের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলা হয়। এবং গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত আবির্ভাব হয় কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যাধির - অটোর। ছারপোকার মতো বংশবৃদ্ধি করে মহানগরীর পরিবহণ ব্যবস্থার নাভিশ্বাস তুলে দেবার জোগাড় করতে থাকে তারা। সঙ্গে মোটর-বাইক, গাড়ী, বাস, ট্যাক্সী, ট্রাক, লরি কি নেই। কিন্তু দূষণের এইসব মূর্তিমান প্রতীকগুলোকে চিহ্নিত না করে সরকারের তরফে জনমানসে একটা স্তবাক্য ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে ট্রামের জন্য জ্যাম হবার কারণেই নাকি দূষণ বেশি ঘটছে। অতএব, ট্রাম তুলে দেবার পক্ষে শুরু করা হয় জোরালো সওয়াল।

কিন্তু বিধি বাম। আকস্মিক ভাবে দেখা যায় ১৯৮০ সালে বিশ্ব ব্যাংক, তাদের প্রথা ভেঙে ট্রামের শতবর্ষ উদযাপনের সময় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের খাতে কিছু টাকা মঞ্জুর করে। বিশ্বে আর কোনো পরিবহণ ব্যবস্থাকে এইভাবে সাহায্য ইতিপূর্বে করা হয় নি। এখানেই কলকাতার ট্রামের জয়। ওই টাকায় সত্যিই কিছু জায়গায় লাইন সংস্কার করা হয়, নতুন ট্রাম কেনা হয়, কিছু পুরোনো ট্রাম নতুন ভাবে বানানো হয় এবং স্বাধীনতার পরে প্রথমবার ট্রাম সম্প্রসারণ করা হয়, মানিকতলা থেকে বিধান নগর এবং বেহালা থেকে জোকা অবধি। মোটকথা বেশ কিছুদিনের জন্য ট্রাম হঠাও স্লোগানটা চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। আবার দ্বিগুণ রোষে, বাস লবি এবং জমি হাঙররা সরকারি স্তরে উঠেপড়ে লাগে ট্রাম উৎখাত করতে। কিন্তু এবারো বিধাতা সাধলেন বাধ। ১৯৯৪ সালে আকস্মিক ভাবে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে উদয় ঘটে রবার্তো ডি আন্দ্রিয়ার। মেলবোর্নের ট্রামকর্মী রবার্তো কলকাতায় এসছিলেন ঘুরতে আর শতাব্দি প্রাচীন ট্রাম ব্যবস্থার সাক্ষী হতে। কিন্তু এসে হালহকিকত দেখে বুঝলেন যে গতিক সুবিধের নয়। ঠিক করলেন ট্রাম পুরোপুরি উঠে যাবার আগে কিছু একটা চেষ্টা করতে হবে। যোগাযোগ ঘটে শহরের ট্রামপ্রেমী শ্রী দেবাশীস ভট্টাচার্যের সাথে, যিনি তার আগে বেশ কিছু বছর ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে সরকারের ট্রাম নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করে আসছিলেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন ট্রাম ও পরিবেশ নিয়ে কাজ করা


'PAGLA' TO PINGLA — ALL ON THE SAME TRACK

# Tramjatra charms jaded city

By Ronojoy Sen
The Times of India News Service

KOLKATA: It was probably Subhas Chakraborty's longest tram ride since his college days.

The transport minister, in his trademark floppy hat, shrugged off the political blues and boarded the Tramjatra special on Wednesday. The green-and-yellow tram took a round of the Esplanade depot and set off for Kidderpore, dropping Chakraborty off at the Maidan.

If nothing else, Chakraborty's presence gave a symbolic lease of life to the beleaguered tramways. He publicly declared his support for trams and pumped for its modernisation. "We want to modernise the tram and take it to other places," he said. But if that seemed more like an empty promise, his assurance that Sourav Ganguly and Steve Waugh will play "bat and ball" on the Kolkata-Melbourne tram brought more cheer to the motley gathering. "The two cricket teams will travel by tram," promised Chakraborty. He will meet the Tramjatra organisers on Thursday to finalise details.

Rudraprasad Sengupta watches the Australian team decorate a tram.

The man of the moment, however, was Roberto D' Andrea — the trammie from Australia who has been tirelessly working on the Melbourne-Kolkata connection for over six years. Roberto, in a Melbourne conductor's uniform but with CTC stitched on his shirt and cap, was paid a handsome compliment by the transport minister. *"Mera joota hai Japani, patloon Englishtani, sir pe lal topi Russi, phir bhi dil hai Hindusthani,"* Chakraborty said, pointing to the Aussie. Even if Roberto could not fully comprehend the words, he definitely got the gist of it.

For those who made the trip on the special tram to Kidderpore and back, it was quite a ride. Besides the lovely view of the Kolkata skyline across the Maidan, the passengers were treated to Roberto's special brand of *"pagla"* conducting as well as songs by a baul from Birbhum and a *chitrakar* from Pingla. The regular CTC conductor, Amit Chatterjee, merely looked on and smiled. For those who accidentally boarded the tram, it was a free ride with a few special Tramjatra tickets thrown in.

The special tram will be on the Kolkata streets for the next four weeks, setting out from different depots in the city. If Calcutta Tramways Corporation managing director Sudhir Dey's words hold good, the passengers will not have to pay any fare. Another bonus for passengers will be Roberto, who has promised to be on board a few hours every day. For anyone with a taste for some spring madness, an opportunity not to be missed.

Subhas Chakraborty enjoys a tram ride.

ममता आई ना

क्या फिरेंगे ट्राम के दिन !

ছবি - রবার্তো ডি আন্দ্রিয়া

সংস্থাগুলির কাছে জরুরী ভিত্তিতে বিপদবার্তা পাঠিয়ে আসছিলেন।

রবার্তো দেশে ফিরে নিজের সংস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ করেন সিটিসির সঙ্গে। স্থাপন হয় কলকাতা-মেলবোর্ন ট্রাম মৈত্রীর এক অদৃশ্য ভিত্তি প্রস্তর। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ট্রামযাত্রা। পরের পাঁচ বছরে কলকাতা ও মেলবোর্নের সরকারি স্তরেও আদানপ্রদান বাড়তে সাহায্য করে রবার্তোর এই ব্যক্তিগত উদ্যোগ। এতে যোগ্য সঙ্গ দিতে থাকেন দেবাশীষবাবু এবং সঙ্গে মহাদেব শী, যিনি গোটা বিষয়টি তদারকীর কাজটা করেছিলেন এবং একইসঙ্গে পুরো অনুষ্ঠানগুলোর সঠিক আকারে একটা ডক্যুমেন্টারি বানাচ্ছিলেন।

২০০১ সালে ইডেনে যখন কলকাতার ঘরের ছেলের অধিনায়কত্বে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচে হারাচ্ছিল অন্যদিকে মাঠের বাইরে আরেক অস্ট্রেলিয়র হাত ধরেই নতুন আশায় বুক বাঁধছিল কলকাতার ট্রাম। সরকারি ভাবে ২০০১ সালের কলকাতা মেলবোর্ন ট্রামযাত্রার পাঁচ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে দুটি ট্রামকে সাজিয়ে সারা শহরে ঘোরানো হলো। বিভিন্ন শিল্পীদের পরিবেশনা, মন্ত্রীদের উপস্থিতি, প্রচারমাধ্যমের ঘনঘটার দরুণ ট্রাম ফের একবার শহরের আনাচে কানাচে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে

ছবি - রবার্তো ডি আন্দ্রিয়া


# Tramways celebrates while the fun lasts

HT Correspondent
Kolkata, February 27

EVEN IF the future of trams hangs in the balance, it did not deter the Calcutta Tramways Company from organising a day-long extravaganza from Esplanade to Tollygunge tram depot today. The programme was a part of the on-going Melbourne Kolkata tram festival.

Two colourfully decorated trams-649 and 626- started from Esplanade with Transport Minister Subhas Chakrabarty and singer Usha Uthup on board.

Usha broke into the song 'Kolkata Kolkata' as soon as the journey began. "Welcome to the Melbourne Kolkata tram utsab," said Usha to all who had gathered on the route. The tram traversed slowly across the lush green maidan towards Kidderpore. As the trams neared Kidderpore, children and adults rushed on to take a close look. Eyes peered from every bus and car. People smiled and waved at the trams. The mood was electric as Usha switched from one hit to another. The first halt came at Kidderpore tram depot.

State Transport Minister Subhas Chakrabarty and Usha Uthup aboard a decked up tram on Tuesday.

From Kidderpore the tram moved towards Kalighat. The CTC had organised a funds raising drive for the Gujarat quake victims. The collections would be handed over to the Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee. Roberto Nunzio D'Andrea, the Australian representative joined alongside the Indians to raise money.

The fund drive was hugely successful. As the tram reached the Kalighat bridge, Chakraborty's voice rang through the air. "This is a festival for the people of Kolkata and we dedicated it to them. We will work for the development and expansion of tram services." From Kalighat Roberto ran and danced moving from one person to another. As a bus driver gave five rupees. Students, elderly men and women eagerly contributed as the tram inched towards Gariahat on its way to Ballygunge. A tired Roberto gulped down a glass of water before resuming his run. He said: "This is a special day for CTC. If the tram festival continues, it could become another major attraction like the Calcutta Book fair." The journey terminated at Tollygunge.

A representative of the Environment Governed Integrated Organisation, an NGO associated with the event said, "This festival should dispel wrong notions regarding the viability of trams." He said that as a most eco-friendly mode of transport, trams should be expanded. To keep liaison with foreign tram companies Calcutta Tram Forum would be formed. The NGO also demanded that only trams be allowed to ply on some important city roads.

ছবি - রবার্তো ডি আন্দ্রিয়া

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

এলো। সরকার ফের কিছুদিনের জন্য হলেও আগ্রহী হয়ে উঠলো ট্রাম কে নিয়ে। শহর ব্যাপী লাইন সংস্কারের কাজ শুরু হলো। লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে যানজট এবং জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই মিলতে শুরু করলো। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ট্রামযাত্রা চালু রেখে রবার্তো, সরকারের ওপর চাপ বজায় রেখে যেতে থাকলেন।

কিন্তু কাঠে ঘুন ধরলে ছাড়ানো প্রায় অসম্ভব। HRBC র নাম করে হাওড়া ব্রিজের ক্ষতি হচ্ছে বলে ১৯৯২ বন্ধ করা হলো ট্রামের আনাগোনা যা কিনা ছিল হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে চলা প্রথম যাত্রীবাহী যান। শিয়ালদায় 'হকার'পুলের (কারণ কোন ভাবেই ওটাকে উড়াপুল বলা চলে না) নামে স্টেশনের সামনে থেকে ট্রাম হঠেছিল আগেই, এবার হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকেও চিরকালের মতো সরে গেল ট্রাম। সরাসরি যার কোপ পড়লো যাত্রী খাতে আয়ের ওপর। এদিকে ২০০১এর পর থেকে ট্রাম লাইন সংস্কারের নামেও হিতে বিপরীত ঘটলো। কংক্রিট করার নামে উড়িয়ে দেওয়া হলো ট্রামের জন্য নির্দিষ্ট বুলেভার্ড। ফলে লাইনের ওপর অন্য যানবাহনের অবাধ গতিবিধি হামেশাই আটকে দিতে থাকে ট্রামের চাকা। ফের গতি হারালো ট্রাম। যারফলে ফের কমতে থাকলো যাত্রী সংখ্যা।

কিন্তু ক্রিকেটে যেমন আমরা অস্ট্রেলীয় লড়াকু মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত তেমনই মাঠের বাইরেও রবার্তোর ঠিক একই রকম হার না মানা একজন মানুষ। তাঁর প্রচেষ্টা জারি থাকলো। সরকারি তরফে, কখন নরম কখন গরম, প্রতিক্রিয়া পাওয়া যেতে থাকলো ট্রাম নিয়ে। কিন্তু পালাবদলের পর থেকেই যেন আশঙ্কার কালো মেঘ আরো বেশি করে ঘনিয়ে আসে। নতুন সরকারের প্রথম পাঁচ বছরে তেমন কোনো পদক্ষেপ না দেখা গেলেও পরের পাঁচ বছর ছিল একের পর এক ট্রাম ধ্বংসকারী পদক্ষেপ পরিপূর্ণ। মন্ত্রী থেকে আমলা, ট্রামকর্মী থেকে পুলিশ, কর্পোরেশন থেকে বহিরাগত মানুষ (যারা এ শহরের হালের বাসিন্দা কিন্তু শহরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র নাড়ির যোগ নেই), সবাই মিলে ট্রাম বন্ধ করতে উঠে পড়ে লাগে।

মেট্রোর কাজ হচ্ছে তাই ট্রাম বন্ধ; শহরের একপ্রান্তে ১০ বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া ট্রাম রুটে ব্রিজ ভাঙলো, কিন্তু সারা শহর জুড়ে সেই অজুহাতে সমস্ত ব্রিজের ওপর ট্রাম বন্ধ; মন্ত্রীর ঘুম হচ্ছে না তাই গড়িয়াহাট ডিপো থেকে বালিগঞ্জ অবধি মহা গুরুত্বপূর্ণ লাইন তুলে দেওয়া হলো; অটোর রুটকে জায়গা করে দিতে হবে কাটমানির জন্য তাই ট্রাম বন্ধ; এমন ভাবে উড়ালপুলের পিলার বসানো হলো যে গোটা একটা ডিপো হয়ে গেল বন্ধ; শহরে মিছিল হবে এক প্রান্তে কিন্তু যানজট হতে পারে এই যুক্তি দিয়ে সারা শহরের ট্রাম বন্ধ; বাইক রেসিং করতে গিয়ে দলের ক্যাডারদের ট্রাম লাইনে পিছলে গিয়ে মৃত্যুর জন্যও নাকি দায়ী ট্রাম; সরকারি উদাসীনতায় বহুদিন কর্মী নিয়োগ না হওয়ার কারণে ট্রাম ড্রাইভারের সংখ্যা তলানিতে তাই ট্রাম বন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি অজুহাতের পর অজুহাত।

এই রকম একটা সময়ে যখন ট্রাম রুট কমতে কমতে কেবল দুটোতে এসে ঠেকেছে, তখন CTUA তথা ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ট্রামযাত্রা কমিটি মিলে এগিয়ে আসে ট্রামের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন করতে। লক্ষ্য একটাই, যে করে হোক মহানগরীর ট্রামকে আবার লোকের মনে ফিরিয়ে আনা; ট্রামকে প্রচার মাধ্যম এবং সমাজ মাধ্যমে চর্চার বিষয় করে তোলা; পরিবেশ সুরক্ষায় ট্রামের মত যানের গুরুত্ব জনমানসে তুলে ধরা; নব প্রজন্মকে ট্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা; এবং এই সবের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে সরকারকে, ট্রামবিরোধী মনোভাব ঝেড়ে, গঠনমূলক আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা।

২০২২ এর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস থেকে শুরু হয় একবছর ব্যাপী একটা উৎসব। সৃজনশীল অনুষ্ঠান, বসে আঁকো, ট্রাম রাইড, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হতে থাকে বিভিন্ন মাসে। অবশেষে আসে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি। কিন্তু যার জন্যে এত কিছু সেই ট্রাম চলছে কোথায়? বসা হলো সরকারের সঙ্গে, অনুরোধ করা হলো আরো কিছু রুট চালু করতে। তার সঙ্গে পুলিশের সঙ্গেও বসা হলো। WBTC র কাছে ট্রাম চাওয়া হলো যেগুলো সাজিয়ে সারা শহর ঘোরানো হবে। মন্ত্রী এবং সর্বোচ্চ স্তরের আশ্বাস সত্ত্বেও নিচু স্তরের কর্মীদের চূড়ান্ত অসহযোগিতার কারণে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় উদ্যোক্তাদের। অনুষ্ঠান হওয়া নিয়ে প্রবল অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। স্পনসররা এসব দেখে শেষ মুহূর্তে হাত গুটিয়ে নেয়। বিদেশ থেকে আগত বহু আগ্রহী ট্রামপ্রেমীদের সামনে উদ্যোক্তাদের সম্মানের প্রশ্নও এসে যায়। দিনরাত সরকারি ভবনে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকে অবশেষে ২৪শে ফেব্রুয়ারির মাত্র তিনদিন আগে সমগ্র অনুষ্ঠানের জন্য সরকারী ছাড়পত্র হাতে আসে। শারীরিক কারণে রবার্তো যদিও অনুষ্ঠানের দুদিন আগে এসে

ছবি - ঝুমা রায় চৌধুরী

ছবি - অর্কোপল সরকার ও আকাশ রায়

আগে এসে পৌঁছান। তিনিও এসব বিশৃঙ্খলা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর খানিকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং আংশিক ভাবে বেসরকারি সাহায্যে নামা হয় কাজে। রবার্তোর কারণে কলকাতায় অবস্থিত অস্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক দূতাবাসও অনুষ্ঠানে অংশিদার হতে আগ্রহ প্রকাশ করে। নির্বাচিত দুটো ট্রামের ভোল বদলে ফেলা হয় রং-তুলির জাদুতে, কাগজের মালা, vinyl স্টিকার, ইত্যাদির সাহায্যে। বাকি আরো ছ-খানা ট্রাম ঝাড়পোঁছ করে তৈরী করা হয় ২৬ তারিখের ট্রাম প্যারেডের জন্য, যা কিনা অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলতে থাকে নাওয়া খাওয়া ভুলে। অবশেষে তিনদিন তিনরাত টানা কাজের শেষে অনুষ্ঠিত হয় ট্রামযাত্রা-২০২৩।

২৪শে ফেব্রুয়ারি মন্ত্রী-আমলাদের দিয়ে ফিতে এবং কেক কাটিয়ে পালন করা হয় ট্রামের সার্ধশতবর্ষ। আর কেবল মাত্র একটাই রুট (৫ নং) পুনরায় চালু করার অনুমতি পাওয়া সম্ভব হয়। তাই ২৫ নং গড়িয়াহাট-ধর্মতলা এবং ৫ নং ধর্মতলা-শ্যামবাজার এই দুই রুটেই প্রাথমিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে ট্রামযাত্রা। সাজানো ট্রাম দুটি বের হয় শহর পরিক্রমায়। ২৫ তারিখ বিভিন্ন স্কুলের বাচ্চাদেরকে বিনামুল্যে জয় রাইড করানো হয়।

এরপর আসে ২৬শে ফেব্রুয়ারি, যেই দিনটার জন্য দেশী বিদেশি সকল ট্রামপ্রেমী অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল। গড়িয়াহাট ডিপোর স্টার্টার সাহেবকে দিয়ে ফিতে কাটানোর পর প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা, নাচ-গান-আবৃত্তির মাধ্যমে, অজস্র ফ্লাশ বালবের ঝলকানির মধ্যে দিয়ে চালু হয় কলকাতা তথা এশিয়ার প্রথম ট্রাম প্যারেড। ক্রমানুসারে ন-খানা

ছবি - ঝুমা রায় চৌধুরী

বিভিন্ন বয়সের ট্রাম একের পর এক লাইন দিয়ে মহানগরীর বুকে এগিয়ে চলেছে, এ এক অকল্পনীয় দৃশ্য। জল গাড়ি, এক কামরার ট্রাম, কাঠের ট্রাম, এসি ট্রাম কি নেই সেই প্যারেডে। কলকাতার ট্রামের বিবর্তনের ইতিহাসটাই তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল যা অসম্ভব ফলপ্রসু হয়। সমাজের সব স্তরের মানুষের সেদিন ভালো লেগেছিল ট্রামকে - বহুদিন বাদে আবারও একবার! গড়িয়াহাট ডিপো থেকে শুরু করে ধর্মতলা হয়ে শ্যামবাজার, তারপর সেখান থেকে ফের ধর্মতলায় এসে শেষ হয়েছিল সেদিনের ঐতিহাসিক প্যারেড। এই সমগ্র পরিকল্পনায় প্রথমদিন থেকে শেষ অবধি এই অধমেরও উপস্থিতি ছিল একজন কর্মকর্তা হিসেবে, যে কিনা CTUA র সদস্য হবার সাথে সাথে রেল ক্যানভাস তথা TrainTrackers পরিবারেরও সদস্য।

যাইহোক, পরদিন ২৭ তারিখ শুরু হলো শহরের অন্য প্রান্তে ব্রাত্য হয়ে থাকা ২৪/২৯ রুটের টালিগঞ্জ ডিপোর একটি ট্রাম সাজানোর পালা। অতিমারির কারণে বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষ পালন করাই যায়নি। TrainTrackers বহুদিন ধরেই আগ্রহী ছিল একটি ট্রামকে সত্যজিৎ রায়ের থিমে সাজিয়ে তাঁর শতবার্ষিকী উদযাপন করার। সুযোগ আসে এতদিনে। CTUA এবং TrainTrackers হাতে হাত মিলিয়ে সত্যজিৎ রায়ের থিমে সাজিয়ে তোলে টালিগঞ্জের ট্রামটিকে। এবং এই পরিকল্পনার পেছনে মূল প্রেরণা ছিল শ্রী রায়ের সুপুত্র শ্রী সন্দীপ রায়ের স্বতস্ফূর্ত সম্মতি। সেদিনই বিকেল তিনটের সময় উদ্বোধন হয় ট্রামটির। পরবর্তী পাঁচটা দিন, ট্রামযাত্রা ট্রামগুলি শহর পরিক্রমা করে সাধারন মানুষকে ট্রামের প্রতি আগ্রহী করার কাজ করতে থাকে।

বাস্তবিক ভাবে দেখলে আজকালকার যুগের মূল মন্ত্রই হলো গতি। হাতের মুঠোয় থাকা ফোনের নেট সংযোগ হোক বা পরিবহনের মাধ্যম হোক সর্বত্রই মানুষের চাই গতি। তাদের হাতে সময়ের বড়ো অভাব। কর্মস্থল হোক বা বাড়ি সবাই চায় যেতে তাড়াতাড়ি। এই গতির দৌড়ে টিকে থাকতে হলে খোলনলচে বদলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অত্যন্ত জরুরী। সেটা সঠিক ভাবে না পারলে যে দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তা আমাদের প্রিয় কলকাতার ট্রামকে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। শতাব্দীপ্রাচীন, পরিবেশবান্ধব ট্রাম কলকাতার ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। সারা বিশ্বে, শহর কলকাতার তিনটি অতি পরিচিত প্রতীকের মধ্যে অন্যতম এই ট্রাম বিগত পাঁচ দশক ধরে সরকারি অবহেলার শিকার। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে ট্রামের প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণ একে ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কাজেই ট্রামের ভবিষ্যত নিয়ে আমরা সকলেই অনিশ্চিত। কিন্তু এত বাধা বিপত্তি পেরিয়েও টিমটিম করে টিকে আছে কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য এই পরিবেশ বান্ধব যানটি। একে রক্ষা করতে সর্বৈত ভাবে চেষ্টা করা কলকাতা বাসিন্দা হিসেবে আমাদের কর্তব্য বলেই মনে হয়।

*প্রচ্ছদ চিত্রগুলি লেখকের দ্বারা প্রেরিত।*

'କଲକାତା ଆର୍ଟ ଫୋରମ୍ ଓ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲବ ଫର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ହେରିଟେଜ୍'

## ଟଲିଗଞ୍ଜ ଡିପୋରେ 'ଟ୍ରାମ୍ ମେଳା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

# জুবিলি ব্রিজ

## নয়া প্রযুক্তির অগ্রদূত...

**ফিরোজ ইসলাম**

গঙ্গার পশ্চিম কুলের সঙ্গে পূর্বের সংযুক্তির সফল প্রয়াসের প্রথম নিদর্শন ব্যান্ডেল এবং নৈহাটির মধ্যে জুবিলি সেতু।

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ১৮৮৭ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২৯ বছর ধরে পরিষেবা দেওয়ার পরে পুরনো সেতু বন্ধ করে নতুন সেতুর ব্যবহার শুরু হয়। সফল সেতু নির্মাণের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠা জুবিলী ব্রিজ পরবর্তী কালে গঙ্গার উপরে আরও একাধিক সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদদের অগ্রসর হওয়ার রসদ যুগিয়েছে।

বাস্তবে, জুবিলি সেতুর ভাবনা মাথায় আসার অনেক আগেই হাওড়া ব্রিজ নির্মাণের বিষয়টি আলোচনায় উঠে এসেছিল। হাওড়া স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে শুরু করার পরে নিছক ফেরি পরিষেবায় যাতায়াতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। কলকাতার মূল ভূ-খন্ডের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের প্রয়োজনে স্থায়ী সেতু নির্মাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভাবা শুরু হয়। সেই সময় ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলের মুখ্য প্রযুক্তিবিদ জর্জ টার্নবুলকে ভার দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করার। বিভিন্ন পর্যায়ে অনুসন্ধান চালিয়ে টার্নবুল জানিয়ে দেন হাওড়ায় সেতু নির্মাণ বিপুল খরচ সাপেক্ষ। নদী খাতের নরম মাটি সেতু নির্মাণের পক্ষে অনুকূল নয়। সমীক্ষা চালিয়ে নদীর উজানের দিকে ২৫ কিলোমিটার এগিয়ে পলতার কাছে শক্ত মাটিতে সেতু নির্মাণের পরামর্শ দেন।

এ দিকে যাত্রীদের নিত্য যাতায়াতের চাহিদা মেটাতে হাওড়ায় আরও কয়েক বছর পরে ১৮৭৪ সাল নাগাদ ভাসমান পন্টুনের উপর তৈরি হয় বিশেষ সেতু। সেটা করতে হয়েছিল কতকটা বাধ্য হয়েই। যাতায়াতের বিপুল চাহিদা পূরণের খানিকটা সুরাহা করার জন্য।

কিন্তু, তখনও গঙ্গার মতো সারা বছর ধরে বয়ে চলা ভরা নদীর খাতের উপর কীভাবে সেতু নির্মাণ করা যাবে তার দিশার খোঁজ চলছিল। কলকাতা বন্দরের জাহাজ চলাচলের জন্য সেতুর নিচের অংশে পর্যাপ্ত জায়গা রাখার পাশাপাশি প্রযুক্তিগতভাবে আরও কিছু অসুবিধা ছিল।

সাধারণ অবস্থায় সেতু নির্মাণের সময় তার ডেক বা কাঠামোকে ধরে রাখার জন্য যে অস্থায়ী ঠেকনার প্রয়োজন হয় তাকে ফলস বলে। সেতু এবং সুড়ঙ্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে ফলসের ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ন। তখন আজকের সময়ের মতো আগে থেকে ঢালাই করা কংক্রিটের বিম বা ডেক বিশেষ ক্রেনের সাহায্যে স্তম্ভের উপর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, যে কোনও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে তার কাঠামো ভার বহন করার মতো যথেষ্ট পোক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঠেকনা বা ফলস দিয়ে সাপোর্ট দিতে হতো।

কিন্তু, গঙ্গার মতো সদা বহতা নদীর ক্ষেত্রে জল ঠেকিয়ে ফলস ব্যবহার করা কার্যত অসম্ভব ছিল সেই সময়। কোনও রকম ঠেকনা ব্যবহার না করে কী ভাবে সেতু নির্মাণ করা যাবে তার প্রযুক্তির সন্ধান চলতেই থাকে।

এর মধ্যেই ১৮৬৭ সালে জার্মান প্রযুক্তিবিদ হাইনরিশ গের্বার প্রথম ফলস ব্যবহার না করে সেতু তৈরির পথ বাতলালেন। জার্মানির ব্যামবার্গের রেগনিৎস নদীর উপর তৈরি করলেন পৃথিবীর প্রথম ক্যান্টিলিভার ব্রিজ। কোনও রকম ফলস ছাড়াই গভীর নদী খাতের উপর ওই সেতু তৈরি হলো। তাঁর নামানুসারে পরবর্তীকালে ক্যান্টিলিভার ব্রিজ গের্বার বিম হিসেবে পরিচিত হলো। ধীরে ধীরে ওই প্রযুক্তির প্রসার ঘটলো।

গঙ্গায় ব্যান্ডেল এবং নৈহাটির মধ্যে ১৮৮৭ সালের জুবিলি ব্রিজ আসলে ক্যান্টি লিভার

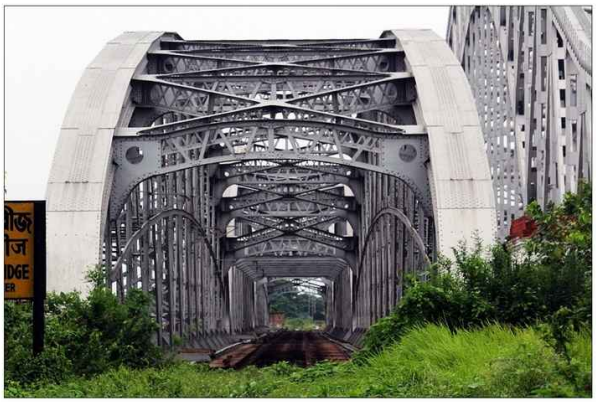

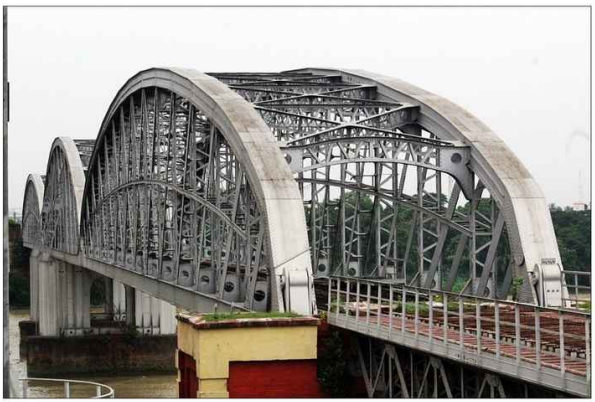

ট্রাস ব্রিজ। স্তম্ভের ন্যূনতম ব্যবহার করে ওই সেতু তৈরি হয়। ইস্পাতের সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সব বিম ব্যবহার করা হয় তা মূলত ত্রিভুজ আকৃতির। একই ট্রাস বলে। প্রযুক্তির নিরিখে ভার বহনের ক্ষেত্রে ট্রাস অনেক বেশি স্থিতিশীল।

গঙ্গায়, যেখানে জলের গভীরতা প্রায় ২৭ মিটার সেখানে কেন ওই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল তার আভাস এখান থেকে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ওই একই প্রযুক্তি আরও আধুনিক এবং পরিমার্জিত রূপ পায় হাওড়া ব্রিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে। ওই সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে দাঁড়ি পাল্লার মতো নিখুঁত ভারসাম্য তৈরি করার জন্য ব্যালান্সড ক্যান্টিলিভার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। হাওড়া ব্রিজের ক্ষেত্রে দু পাশে অ্যাঙ্কর আর্ম বা মূল স্তম্ভ তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে দু পাশ থেকে শূন্যে ক্রেন ব্যবহার করে সেতুর নির্মাণ কাজ চালানো হয়।

অন্যদিকে ১৮৮২ সাল নাগাদ ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদ ব্র্যাডফোর্ড লেসলি এবং এ এম রেন্ডেল জুবিলি ব্রিজের নকশা তৈরি করেন। ওই সেতুর মাঝের স্প্যান ৩৬০ মিটার দীর্ঘ। দু পাশের দুটি স্প্যান ৪২০ মিটারের। মাঝখানে থাকা দুটি স্তম্ভ ইঁটের তৈরি। তার উপরে সেতুর কাঠামো ইস্পাতের স্তম্ভ দিয়ে যুক্ত। এই সেতুর বিভিন্ন অংশ জোড়া হয়েছিল রিভেট ব্যবহার করে। কোথাও কোনোও নাটবোল্ট নেই।

দেশের মধ্যে এই সেতুতেই প্রথম পেন্ডুলাম বেয়ারিং ব্যবহার করা হয়। মূলত ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপত্তির ক্ষেত্রে সেতুর উপরের কাঠামোকে স্তম্ভগুলির থেকে পৃথক করার জন্যই ওই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। ভূ পৃষ্ঠের কম্পন সেতুর কাঠামোকে ওই ব্যবস্থায় সরাসরি প্রভাবিত করে না। এ ছাড়াও রেলের মতো ভারী যানের যাতায়াতের কথা ভেবেও ওই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। ওই সময় সেতু নির্মাণের ইস্পাত আনা হয়েছিল ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড থেকে।

ইংল্যান্ডে মহারানীর শাসনভার গ্রহণের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন সেতুর নাম রাখা হয় জুবিলি ব্রিজ। সেতুর উপর দিয়ে একটিই ট্রেন চলার মতো ট্র্যাক ছিল। তবে, বিভিন্ন গেজের ট্রেন চলার সুবিধার কথা মাথায় রেখে পরে ১৯১০ সালে সেতুর উপর গন্টলেটেড ট্র্যাক বসানো হয়। ওই প্রযুক্তিতে একই ট্র্যাক বেডের উপর বিভিন্ন গেজের ট্র্যাক সমান্তরাল ভাবে থাকে। তাতে মিটার গেজের পাশাপাশি ব্রড গেজ ট্রেনও চালানো যায়।

বহু বছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে পরিষেবা দেওয়ার পরে ২০০০ সাল নাগাদ বিকল্প সেতু নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এবং এর পাশেই সম্প্রীতি সেতু বা নতুন জুবিলি ব্রিজের কাজ শুরু হয় কয়েক বছরের মধ্যে।

রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের তত্বাবধানে কন্টিনিউয়াস ট্রাস ব্রিজ হিসেবে গড়ে তোলা হয় ওই সেতুকে। বো স্ট্রিং গার্ডার ব্যবহার করে তৈরি হওয়া নতুন সেতুতে পাশাপাশি দুটি লাইন রয়েছে। মাঝখানে নদীগর্ভে ডি ওয়াল - ওয়েল বা ইংরেজী ডি আকৃতির হরফের আকারের কূপ খনন করে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে ওই সেতুর ক্ষেত্রে।

কিন্তু প্রায় ১২৯ বছর ধরে চালু থাকা জুবিলি সেতু শুধু নির্মাণ ক্ষেত্রে সাফল্যের নিদর্শন রাখার পাশাপাশি পরে বহু সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার কাজও করেছে।

*প্রচ্ছদ চিত্র - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী* *উল্লেখ ব্যতীত সমস্ত চিত্রগুলি অর্কোপল সরকারের সৌজন্যে*

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

# রেলপ্রেমীর ডাইরি থেকে...

পর্ব-৩

## বিপ্লব দেবনাথ

রাতের শেষ আপ ট্রেনের সময় তখনও বেশ দেরি। যদিও শেষ ডাউন ট্রেন অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। ঠিক রাত ১১টা নাগাদ কেবিনে রিপোর্ট করেই দুজনের পা পড়লো রেললাইনে। এখন সারা রাত ট্র্যাকে টহলদারী করাই আমাদের ডিউটি। এই ডিউটির পোশাকি নাম 'কোল্ড ওয়েদার পেট্রোলিং' ডিউটি। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই চলে এই ডিউটি। যাত্রীরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিরাপদভাবে যাতায়াত করছেন আর যাত্রীদের সেই নিরাপত্তার ভার আমাদের হাতে। ট্র্যাকের ওপর ১৩০ কিমি বেগে চলন্ত রাজধানী এক্সপ্রেসের সুরক্ষার ভারও আমাদের হাতেই কিন্তু। কারণ ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই ট্র্যাক। প্রতিনিয়ত মাথার ঘাম ফেলে তাকে সুরক্ষা প্রদান করাই আমাদের কর্তব্য।

দীর্ঘসময় হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে যে স্থানে পৌঁছলাম, সেখানে রেলট্র্যাকের দু-পাশে অন্যান্য জায়গার মতো বস্তির কোনো চিহ্নমাত্র নেই। যেদিকে নজর যায়, শুধু দিগন্তবিস্তৃত চাষের ফাঁকা জমি। ধান কেটে গোলা তৈরি করা হয়েছে, এখন সেগুলো ঝাড়ার অপেক্ষায়। ফাঁকা মাঠ হেতু তীব্র হিমের উত্তুরে হাওয়ায় হাড় যেন কাঁপিয়ে দেয়। প্রায় কমবেশি আট কিলোমিটার হেঁটে টহলদারী করতে হয়। মাঝেমধ্যে পথিমধ্যে রেলগেটে একটু বিশ্রাম বা ব্যাগ থেকে ফ্লাস্ক বের করে একটু চা কিংবা সিগারেট খাওয়া চলে। তারপর আবার লাইন চেক করা। যদিও হিম ঠান্ডায় গরম জামাতেও সচরাচর শীত মানে না। আর রাতের চাইতে মূলত ভোরবেলায় দিকেই ঠান্ডার তীব্রতা বেশি। তার ওপর কোথাও ফিসপ্লেট ফাটলে বা রেলে ফাটল হলে তো কথাই নেই। যেহেতু ঠান্ডায় ধাতু সংকোচন হয়, তাই রেলট্র্যাকে ফাটলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। যদিও ফিটিংস ওকে থাকলে অতটা সমস্যা হয় না। তবুও ঠান্ডায়-বৃষ্টিতে কিংবা তীব্র গরমেও সবার আগে আগে যাত্রীসুরক্ষা, তারপর সব। যেরকম ২০১৮ সালেই প্যাট্রোলিংয়ের সময় নজরে আসে একটি নয়, দুটি নয় একেবারে তিন-তিনটি ফিসপ্লেটে ফাটল। সারারাত ওখানেই হিম ঠান্ডার মধ্যে উপস্থিত থেকে লাইনের উপযুক্ত সুরক্ষা করে তবেই বাড়ি ফিরেছিলাম। পরনের শীতপোশাক হিম ঠান্ডায় আর কুয়াশায় ভিজে পুরো সপসপে হয়ে গেছিল। কিন্তু সবার আগে যাত্রীসুরক্ষা; আর ফাঁকা জায়গাতে কুয়াশা বেশি পরিমাণে পড়বেই। অবশ্য যতই ঠান্ডা থাকুক, পাথরভরা রেললাইনে কাঁধে ভারী রেঞ্চ আর হাতুড়ি, ডিটোনেটর নিয়ে হাঁটলে শরীর ঘামে ভিজে যেতে বাধ্য।

টর্চের আলো ফেলে চলতে চলতে কি যেন মনে করে সহসা টর্চের আলো পেছনে ফেলতেই গুলির মতো দুটি কাঁচের বল যেন চকচক করে উঠলো। বুকটা হঠাৎ ধক করে উঠলো আকস্মিকতায়। অবশেষে ভালো করে দেখে বুঝলাম কিছুই না, লেজ গুটিয়ে একটা শিয়াল লাইন পারাপার করছে। ঘড়ির কাঁটা রাত পৌনে একটার ঘরে। শীতের তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছে, সাথে শীতল হাওয়ার আবেশ। যদিও শীতকাল আমার বড্ড প্রিয় একটি ঋতু। ফাঁকা রেললাইন ধরে ট্রেনকে সামনে রেখে দুজন হাঁটছি। তীব্র কুয়াশায় চারপাশের কিছুই ঠাহর করা যায় না। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসে নিশাচর পাখির ডাক, বা কখনও ঝিঁ ঝিঁ পোকার তীক্ষ্ণ কোরাস। দূরের জঙ্গলে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া ডাকও যেন পরিবেশ হাড়হিম করে তোলে। হিমেল রাতের ঘন কুয়াশার সৌজন্যে ২০ মিটার দূরের সিগনাল পোস্টের আলোও বোঝা দায়। ভাবছি তাও তো আমাদের এদিকের লাইনের দুপাশে বস্তি থাকে, সেরকম কোনো বিপদে পড়লে লোকজনের

সাহায্য পাওয়া যায়। লাইনে কোনো মানুষ রান ওভার হলেও পরিস্থিতি সামলানো যায়।

কিন্তু ভারতীয় রেলওয়ের কত দুর্গম এবং ভয়ঙ্কর এলাকা আছে, সেসব ভাবলেই বুক কেঁপে ওঠে। জঙ্গলঘেরা সম্পূর্ন জনমানবহীন হিংস্র শ্বাপদে ভরা রেললাইন, পাহাড়ের ওপর ঘাট সেকশন, আদ্রা-চক্রধরপুর কিংবা শালবনী ইত্যাদি মাওবাদী প্রভাবিত এলাকা, আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর কিন্তু দুর্গম কোঙ্কন রেলওয়ে এলাকা, মরু এলাকা কিংবা উত্তরবঙ্গের ঘন জঙ্গলের মাঝে রেলপথ জুড়েই আছি আমরা। তাছাড়া হাতির এবং সাপের ভয় তো আছেই। স্বভাবতই অনেক Whatsapp কেন্দ্রিক রেল এমপ্লয়ী গ্রুপে যুক্ত আছি। সেই সূত্রে গতবার একটি ভিডিওতে দেখেছিলাম, রাতে পেট্রোলিং করতে করতে পেট্রোলম্যানরা ট্র্যাকে দ্বিখণ্ডিত চিতাবাঘের দেহ আবিষ্কার করেছেন। ফলতঃ জীবন্ত শ্বাপদের সৌজন্যে প্রাণের রিস্ক তো থাকেই। তাছাড়া আমাদের সেকশনেই কতদিন দেখেছি ভয়ঙ্কর কালাচ সাপ, এবং তার চাইতেও ভয়ঙ্কর চন্দ্রবোড়া সাপের। যার এক ছোবলে নিমেষেই দেওয়ালে ঝুলবে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া ছবি।

বছর কয়েক আগের ঘটনা, তখন কীপ্যাড ফিচার ফোনের জমানা ছিল। বরাবরই আমার পুরনো রেলপথ, মিটারগেজ রেলপথ কিংবা দুর্গম অঞ্চলের রেলপথ ভীষনভাবে আকর্ষণ করতো। আমার এক সহকর্মী পোস্টিং ছিলেন নর্থ ইস্টার্ন সীমান্ত রেলওয়েতে। পরবর্তীকালে সে পরীক্ষা দিয়ে ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকুরীলাভ করে। শীতের দুপুরে দুজনে বসে বসে অসমের রোমাঞ্চকর চাকুরীজীবনের গল্প শুনছি। শুনতে শুনতেই ওর কার্বন মোবাইলের ছোট্ট স্ক্রিনে একটা ফটো দেখালো। দেখলাম, ঘন বনজঙ্গলের মাঝ দিয়ে কাঠের স্লিপারের একটি রেলপথ, রেলপথের একপাশে বিশাল খাদ। প্রথমে আমি

তো দেখেই ভেবেছিলাম, এটা একটা পরিত্যক্ত রেলপথ। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙলো ওর কথাতে। জানলাম যে ওটা মোটেই পরিত্যক্ত রেলপথ নয়। ওই ট্র্যাকেই ওরা রাতে পেট্রোলিং করতো। আর ওদের আগে আগে নাকি আর্মি যেতো, যেহেতু সেখানে তখন বোড়ো-আলফা জঙ্গিদের ভয়। আর পাহাড়ে নাকি প্রচুর নাশপাতি ফল ফলতো, সেগুলো খিদে পেলে তৃপ্তি সহকারে খেত। আর তেষ্টার জল হিসেবে পাহাড়ের গা বেয়ে চুঁইয়ে আসা ঝরনার জল তো আছেই। সেকশনটি বোধহয় অসমের বদরপুর সেকশনে, এখন যেটা ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে।

হাঁটছি দুজনে, নিজেদের পায়ের শব্দে অনেক সময় নিজেদেরই চমকে উঠতে হয়। কিছুই না হয়তো তবুও গা ছমছম করে। কত অভিশপ্ত এই রেললাইন, কত মানুষের মৃত্যু রচিত হয় এই ট্র্যাকে। মাঝেমধ্যে লাইনে হাঁটতে হাঁটতে ছেঁড়া জুতো দেখলেই বুকটা ধক করে ওঠে, জানি না কোন হতভাগ্যের ওই পাদুকাখানি। কদাচিৎ মানুষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশও যে নজরে পড়ে না, তা বলবো না। আর গভীর রাতে জনমানবহীন রেললাইনে সে দৃশ্য বড়ই ভয়াবহ। প্রচুর এরকম ঘটনার সাক্ষীও থাকি আমরা।

গুমা ব্রিজের থামে বসে আছি এক রাতে। শেষ আপ ট্রেনের সময় হয়ে গেছে প্রায়। বসে বসে সিগারেট টানছি, ঠান্ডায় সিগারেটের ধোঁয়ায় বেশ মৌতাত জমেছে। হঠাৎ মনে পড়লো, কেউ একজন বলেছিল সকালে ব্রিজে নাকি একজন ভদ্রমহিলা গলা দিয়েছিলেন। চকিতে ঘটনাটা মনে পড়তেই উঠে দাঁড়ালাম। টর্চ নিয়ে লাইনে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই জায়গাটি নজরে আসলো। ঠিক আমরা যেখানে বসেছিলাম, ঠিক তার পেছনেই স্পটটি। কাছে গিয়ে উবু হয়ে দেখলাম, ওই মহিলার ছেঁড়াখোঁড়া চুলের অংশ পড়ে রয়েছে। আর রক্তের দাগ তো সহজে অদৃশ্য হয়ে না।

ট্র্যাকের ডিউটি এমনিতেই বিপজ্জনক। তার ওপর শীতকালীন এই প্যাট্রোলিং ডিউটি আরও খতরনাক। এমনিতেই তীব্র কুয়াশায় যেমন সামনের কয়েক ফুট দূরের দৃশ্যও ঠাহর করা যায় না। তার ওপর রিভার্স ট্র্যাক কিংবা হাই স্পীড ট্র্যাক হয় তাহলে তো কথাই নেই। ফলস্বরূপ প্রচুর ট্র্যাকম্যানরাই রেল দুর্ঘটনায় পড়েন। তবুও ডিউটি আগে,লাইনের সুরক্ষা সর্বোপরি যাত্রী নিরাপত্তা সবার আগে। সেটা তো পালন করতেই হবে। আর এটা তো মানতেই হবে চ্যালেঞ্জিং ডিউটিতে একটা রোমাঞ্চ তো অবশ্যই আছে।

রাতের শেষ আপ বনগাঁ লোকালটি প্রায় ৭ মিনিট লেটে তীব্রবেগে ২৫ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটটি ক্রস করে অশোকনগরের দিকে বেরিয়ে গেল। শেষ কামরার টেল ল্যাম্পের লাল আলোটি দপদপ করতে ক্রমশঃ উজ্জ্বল থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। আরও প্রায় আটটি স্টেশন অতিক্রম করার পর আজকের মতো তার ডিউটি শেষ এবং তারপর সাইড লাইনে স্টেবল হয়ে তারও কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার পালা। রেলের বড় ঘড়ির কাঁটা দ্রুত রাত ১ টার দিকে এগিয়ে চলেছে। পরের ট্রেন বলতে ডাউনে সেই ০৩.৪৪ এর ১২ কোচের ফার্স্ট ট্রেন। প্রায় আড়াই ঘন্টার বড় একটি গ্যাপ এখন। নিঃস্তব্ধ রাত, জনমানবহীন রেলগেট আর পাশেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ঘুমন্ত পৃথিবীর মাঝে আওয়াজ বলতে দূর থেকে আগত ক্ষীণশব্দে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা রেওয়াজ। চাঁদের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় আশেপাশের গাছগাছালিগুলি কেমন যেন রহস্যবৃত লাগছে।

জামা খুলে ঘর্মাক্ত দেহে বাইরের টিউবওয়েলে এসে চোখেমুখে ঠান্ডা জলের ছিটে দিতেই ক্লান্ত শরীর জুড়ে বেশ একটা আরামের শিহরণ বয়ে গেল। আর ক্লান্ত কেনই বা লাগবেনা! সারাদিনে বা রাতে অগুনতি বার গেটের উইঞ্চ মেশিন ঘোরানো, লিভার টানা, পাবলিকের সাথে কথা কাটাকাটি আর গেট রক্ষনাবেক্ষন করতে করতেই কখন যে ক্লান্তি এসে যায় বুঝতেও পারিনা। দরকার একটু রেষ্টের,একটু বিশ্রামের। ঘাড়ে, গলায়, মুখে ভালো করে ঠান্ডা জলের ছিটে দিয়ে গা মুছে শরীরটা চেয়ারে এলিয়ে দিতেই মুখ থেকে অজান্তেই আরামসূচক 'আঃ' শব্দ বেরিয়ে আসলো। মোটামুটি আড়াই ঘণ্টা বেশ রেস্ট করা যাবে এখন। মোবাইলটি পাশে রেখে ১০ মিনিটও রেস্ট হয়েছে কি সন্দেহ! ম্যাগনেটিক টেলিফোনের তীব্র ক্রিং ক্রিং শব্দ রাতের নিঃস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিলো। এর মানে একটাই, আপে কিংবা ডাউনে কোনো মালগাড়ি বা লাইট ইঞ্জিন অথবা টাওয়ার ভ্যান আসছে।

রেলগেটের অদূরেই বিদ্যাধরীর ওপর গুমা রেল ব্রিজ। আপে টাওয়ার ভ্যানের তীব্র হলুদ আলো ক্রমশ গেটের দিকে ছুটে আসছে, ভ্যানটি সম্ভবত বনগাঁ যাবে। জামা পড়ে, টর্চ নিয়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়াতেই পুনরায় সশব্দে টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ধ্বনি। রিসিভার কানে তুলতেই ভেসে এলো স্টেশন মাস্টারের গলা। ডাউনেও একটি মালগাড়ি অশোকনগর ছেড়ে দিয়েছে। টাওয়ার ভ্যান ইতিমধ্যে গেট ক্রস করে গেছে, গেট খোলার আর কোন প্রশ্নই আসে না। স্লট টেনে ডাউনের সিগনাল দিতেই প্যানেলে হলুদ আলো জ্বলজ্বল করে উঠলো, কারণ গুমা হোম তখনও লাল। মুখে বাঁশি আর হাতে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ক্ষণপরেই হেডলাইটের তীব্র আলোর সাথে সবুজ রঙের গোমো শেডের WAG9 এর সাথে BCNA রেকের ঘটাং ঘটাং শব্দ শুরু হলো। নিমেষে ক্লান্তি-শ্রান্তি উধাও, কারণ সারাদিন লোকাল ট্রেন দেখতে দেখতে গা সয়ে যায় এবং সত্যিই একঘেয়ে লাগে। তাই মালগাড়ি, ইঞ্জিন এসবের খবর হলে কান খাড়া হয়ে ওঠে অজানা আনন্দে। মুহূর্তেই ক্লান্তি-শ্রান্তি ফুস করে কোথায় যে মিলিয়ে যায়, তা আমিই জানি। অনেকটা যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকা রবিবারের দুপুরের মাংস-ভাতের মতো।

আনুবীক্ষনিক একটি জীব, যার গতিবিধির কূলকিনারা মাইক্রোস্কোপের লেন্স ছাড়া অজানা। তারই দাপটে আমাদের গর্বের ভারতীয় রেলের চাকা প্রায় থমকে ছিল। যে কটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করতো তাও স্বাভাবিক সময়ের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পার্সেন্টজের তুলনায় অতি নগন্য। ব্যস্তসর্বস্ব ট্র্যাক সেদিন ট্র্যাফিকবিহীন। সবুজ সিগনালের গ্রীন করিডর ছিল মালবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য। যেখানে আগে যাত্রীবাহী ট্রেন পাস করানোর জন্য মালগাড়িকে স্টেশনে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো, তখন সেই ব্যাপারটি প্রায় সম্পূর্ন উল্টো বললেই চলে। স্বাভাবিক সময় বনগাঁ সেকশনে দিনের বেলায় কদাচিৎ গুডস ট্রেন চলাচল করতো। বেশিরভাগই পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করতে দেখেছি রাতের অন্ধকারে চলাচল করতে। কতদিন যে নাইট পেট্রলিংয়ে ট্র্যাকে হাঁটার সময় লাল রঙের HWH WDM3D বা অন্যান্য রঙের অ্যালকোর মাদকতাময় হর্ন শুনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ওই সময় দিনে-রাতে ট্র্যাকজুড়ে রাজত্ব BCNA, BOXN, BTPN সহ WAG9, WAG7, WDS6R, WAG5 দের। লকডাউনের প্রথম থেকেই ডিউটি করেছি, দেখেছি কোভিড-১৯ স্পেশাল পার্সেল ট্রেন। মস্ত বড় রেক নিয়ে ছুটছে কল্যাণ শেডের WAG9, আবার ডাউনে ছুটে আসছে BKSC শেডের WAG7। আর শুধু মালগাড়ির ইঞ্জিনই নয়, WAP7, WAP4 এইসব যাত্রীবাহী ইঞ্জিনকেও দেখেছি গুডস ট্রেন টানতে। সময়ের সাথে সাথে তীব্র গতিতে ট্র্যাকজুড়ে ছুটছে নির্দিষ্ট গন্তব্যের পানে। কখনও ফোনে, আবার কখনো ক্যামেরাতে লেন্সবন্দি হয়েছে অবিস্মরণীয় সেইসব মুহূর্তগুলো।

তীব্র দাবদাহের গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ন। লাল আভায় রিক্ত পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের অবস্থান হলেও তাপপ্রবাহের মাত্রা কিন্তু বিন্দুমাত্র কমে নি। অদূরের চাষের জমিতে অন্নদাতাদের তীব্র পরিশ্রমের চিহ্ন কপালের স্বেদগ্রন্থি জুড়ে বিন্দু বিন্দু ফুটে উঠেছে। বিশ্রাম নেই অন্নদাতাদের, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা জুড়ে ক্ষেতই তাঁদের কাছে মায়ের কোল। অমানুষিক কষ্টেও তাঁদের শরীরী ভাষায় উচ্চারিত হয় "আমরা চাষ করি আনন্দে।" চাষের ক্ষেতকে আড়াআড়ি ভাবে বিভক্ত করে রেললাইনের দুটি শাখা সমান্তরালভাবে সীমান্ত শহরের পানে চলে গেছে। তারপরও রেললাইনের পথ চলা না থেমে সোজা পাড়ি দিয়েছে বাংলাদেশের পানে। তপ্ত রেললাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে দূরে নজর করলে অদ্ভুত শূন্যতায়

লি লি করে, সাথে সৃষ্টি হয় অদ্ভুত এক আবছা ধোঁয়াশার। শরীরের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় যেন।

জমির এক পাশ বরাবর ক্ষয়ে যাওয়া পিচের সংকীর্ণ এক রাস্তা। পিচের ক্ষয়ে যাওয়া রাস্তা আর রেললাইনের সংযোগে রয়েছে C ক্লাস একটি নিঝুম রেলগেট। গ্রাম্যরাস্তাটির পূর্বদিকের মিলিত স্থান হলো আন্তর্জাতিক যশোর রোড আর রাস্তাটির পশ্চিমদিক হারিয়ে গেছে দিগন্ত বিস্তৃত ধানজমির মাঝে। গ্রাম্য রাস্তাটির পশ্চিমের সমাপ্তিতে রয়েছে গাছপালাঘেরা তিন-চার ঘরের এক আদিবাসী বসতি। আর রয়েছে সেচের জলের জন্য শ্যালো মেশিন এবং বিদ্যুৎ ডিপার্টমেন্টের ট্রান্সফর্মারের ঘর। মূলত এই ট্রান্সফর্মার পাহারা দেওয়ার জন্য এই স্বল্পবসতি স্থাপন করা হয়েছে। এরজন্য বিদ্যুৎ ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়মিত মাসোহারাও দেওয়া হয় বসতির মানুষদের। ক্ষুদ্র এই বসতির শেষেই দিগন্তবিস্তৃত চাষের জমি এবং ঠিক তারপরেই লোকালয়ের অস্পষ্ট রেখা এবং লোকালয়টির নাম বাইগাছি। লোকালয়ের পরেই বিদ্যাধরি খাল পেরিয়ে ONGC অশোকনগর তৈল উত্তলন ক্ষেত্র।

সর্ষে ফোড়ন দেওয়া টমেটোর ডাল নামিয়েই কড়াই চাপালুম স্টোভের ওপর।ভাত অনেক আগেই হয়ে গেছে,আর এখন ডাল রান্না কমপ্লিট হলো। বাকি আর শুধু আলুভাতের জন্য শুকনো লঙ্কাভাজা আর রসুন-লঙ্কা দিয়ে ডিমের অমলেট। গেটগুমটির ঘড়ির কাঁটা সময় জানান দিচ্ছে বিকেল প্রায় সোয়া তিনটে বাজতে চলেছে। অনেক লেট করেই আজ রান্না বসাতে হলো। রেলগেটের অ্যাপ্রোচ অংশে রেলের কন্ট্রাক্টর কর্তৃক স্লিপার প্যাকিংয়ের

কাজ হয়েছে আজ। তীব্র ভ্যাপসা গরমে এমনিতেই কাজ করা তীব্র কষ্টকর, তার ওপরে তপ্ত রেললাইনে এরকম অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। ফলস্বরূপ কাজের ফাঁকে ফাঁকেই গেটগুমটির সিলিং ফ্যানের হাওয়ার পরশে ক্ষনিকের জিরিয়ে নেওয়া আর তেষ্টায় গলা ভিজিয়ে নেওয়া। ওদিকে কাজ পুরোপুরি মিটতে মিটতে ঘড়ির কাঁটা বেলা আড়াইটের দোরগোড়ায়। খিদেয় চোটে নাড়ী যেন জ্বলছে। অগত্যা ওনারা বিদেয় হলেই ঝপঝপ করে কাকস্নান করেই রান্না চাপালুম।

লকডাউনের সময়কাল, ট্রেনের সংখ্যাও নগন্য। যেকটা চলছে, সবগুলোই কর্মচারী স্পেশাল। আর মাঝে মাঝে লাইট ইঞ্জিনের টহলদারী, এর ফাঁকে ফাঁকেই রান্না। রসুন আর কাঁচালঙ্কা দেওয়া অমলেট কড়াই থেকে নামাতেই গেটের টেলিফোন সশব্দে জানান দিলো, গাড়ির খবর হয়েছে। বুঝলুম, ডাউনের স্টাফ স্পেশাল অশোকনগর হোমে ঢুকছে। অগত্যা আর কি! হাত ধুয়ে গুমটির বাইরে এসে উইঞ্চ মেশিন ঘুরিয়ে বুম ফেলতে ফেলতেই দেখি, গেটের পাশের মরা বেলগাছের ছায়ায় এক পৌঢ় দুটি বোঁচকা নিয়ে বসে আছেন। গায়ের জামা ঘামে ভিজে সপসপে প্রায়। আর গামছা দিয়ে বারবার ঘর্মাক্ত নাক-মুখ মুছে নিচ্ছেন। ভাবলাম, হয়তো তীব্র দাবদাহের ক্লান্তিতে ক্ষনিকের জন্য একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। যাই হোক বুম লক করেই ডাউনের স্লট টানতেই প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলজ্বল করে উঠলো। দূরে অস্পষ্টভাবে কানে আসছে পাঁচ কোচের স্টাফ স্পেশালের হর্ন। লাল-সবুজ পতাকা নিয়ে বাইরে দাঁড়ালাম, ক্ষণিকপরেই সদ্য বসানো ৬০ কেজি রেলের ওপর দিয়ে মসৃনভাবে বেরিয়ে গেল বিকেলের ডাউন স্টাফ স্পেশাল। এরপরের ট্রেন তাও প্রায় দেড়ঘন্টা পরে। চেয়ারে বসে নিশ্চিন্তে শুরু হলো দুপুরের লাঞ্চ। চেয়ারে উপবিষ্ট আমি আর আমার সম্মুখে থালায় গরম গরম ভাত, সরষে ফোড়ন দিয়ে টমেটো-ধনেপাতার মুসুর ডাল, শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে আলু-টমেটো সেদ্ধ মাখা আর রসুন-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ডিমের অমলেট। সুরুৎ করে একবার জিভের জল টেনে নেওয়ার আওয়াজও বোধহয় হলো। জাগতিক সমস্ত কিছু ভুলে আমার মনোনিবেশ তখন শুধু স্টিলের থালাতেই সীমাবদ্ধ। খানিক্ষণ হাপুস-হুপুস আর ঢেঁকুরের তৃপ্তিমিশ্রিত আওয়াজের পর অবশেষে থামলো খাদ্যযাত্রা এবং নাড়ী দমানো।

প্রায় আধঘন্টা লাগিয়ে দিয়েছি ভোজনের নিমিত্তে। খাওয়াটা একটু শান্তিতে না খেলে কি হয়। এঁটো থালা নিয়ে বাইরের টিউবওয়েলে আসতেই চোখ আটকে গেলো বেলগাছটির নীচে। বয়স্ক মানুষটি তখনও সেখানে বসা। রেলগেটের আশেপাশে আর কোথাও জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই। ভাবলাম, খুব ক্লান্তি আর খিদেয় হয়তো শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। থালা ধুয়েই গেলাম বয়স্ক মানুষটার পানে।

শুধোলাম, "ও দাদা, শরীর খুব খারাপ লাগছে নাকি। তাহলে গেটে এসে একটু পাখার তলায় বসুন আর একটু গলা ভিজিয়ে নিন, বেশ ভালো লাগবে। আর যা গরম পড়েছে, তাতে তো ক্লান্ত হওয়াই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।"

প্রত্যুত্তর আসলো, "হ্যাঁ বাবা, এই গরমে রেললাইন ধরে হেঁটে হাঁপিয়ে গেছি। আর কি, বয়স হয়ে গেছে তো, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছি গাছের ছায়ায়। আর হাঁটা ছাড়া বা উপায়ই কি আছে! তোমাদের ওই স্টাফ স্পেশাল ট্রেনে তো আর আমরা উঠতি পারবুনি, তাই রেললাইন ধরেই হাঁটা লাগিয়েছিলুম অশোকনগর থেকে গুমা। আর হ্যাঁ, মোটে হয়তো একটা স্টেশন, তবুও ট্রেনে উঠে ফাইন করলে টাকা কোথায় পাবো বাবা বলো! তার ওপর লকডাউনের বাজার। কোনো রোজগার নেই মোটে। আর আমাদের মতো মানুষের সঞ্চয়ই বা কোথায়! তাই দুটি ব্যাগে ঝুড়িভাজা নিয়ে যাচ্ছিলুম, গুমা হাটের দিকে। বিক্রিবাটা করে যদি কিছু লাভ হয় সেই আশায়। আর এই সময় রাস্তায়ও তো সেভাবে যানবাহন চলছে না এবং চললেও ভাড়াও অনেক বেশি। আর যেতে আসতে ভাড়ায় সব টাকা চলে গেলে বাড়ির নুন-তেল আনবই বা কিভাবে!"

অভয় দিলাম, "স্টাফ স্পেশালে তো এখন অনেক সাধারণ যাত্রীই যাতায়াত করে, তাই হাট থেকে ফেরার সময় আপনিও উঠে পড়বেন ভেন্ডরে। মোটে একটি স্টেশন তো, আশা করি কিছু হবে না। তবুও কপাল খারাপ থাকলে।"

জলের বোতলটি বাড়িয়ে দিতে ঢকঢক করে অনেকটা জল শেষ করে বৃদ্ধ বেশ একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ভাবলাম, জলের সাথে একটু 'স্থল'ভাগেরও আপ্যায়ন করে দেখি না হয়।

শুধোলাম, "কাকা যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি, আমি একটু আগেই ভাত-ডাল রান্না করেছি। আপনাকে একটা ডিম অমলেট করে দিচ্ছি আপনি পাখার নীচে বসে নিশ্চিন্তে তৃপ্তি করে খান। খেয়ে দেয়ে রেস্ট করে আপনি হাটে যাবেন না হয়।"

কিন্তু না, প্রত্যুত্তরেই আশাহত হলুম। একটু আগেই বাড়ি থেকে পেটপুরে খেয়ে এসেছেন, তাই খিদে বিন্দুমাত্র নেই! ভ্যাপসা গরমে রেললাইনে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে তাই জিরিয়ে নিচ্ছিলেন।

তবুও ভদ্রতার খাতিরে বললাম, "কাকা আমি কিন্তু আপনার ছেলের মতো। আপনি কোন সংকোচবোধ না করেন তাহলে কিন্তু নিশ্চিন্তে খেয়ে যেতে পারেন। সবকিছুই গরমগরম রয়েছে, শুধু একটা ডিম অমলেট ভেজে দিতে আর কতক্ষন!"

কিন্ত পুনরায় আমার অনুরোধ যখন প্রত্যাখ্যান করলেন, তখনই বুঝলাম সত্যিই তার খিদের ক্লান্তি নেই। বললেন, "খিদে পেলে সত্যিই খেতাম বাবা তোমার খাবার, এতো করে যখন বলছো। কিন্তু আমি একটু আগেই বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি একজন অচেনা মানুষকে যেভাবে খাওয়ার সেধেছো, তাতে আমার মন ভরে গেছে বাবা। বেঁচে থাকো তুমি অনেক বছর।"

মানিব্যাগ থেকে ১০ টাকার একটি নোট বের করে ৫ টাকা প্যাকেটের দুটি ঝুড়িভাজা নিলাম। এই ঝুড়িভাজা নামক খাদ্যবস্তুটি আমার বরাবর প্রিয়। গেটের সামনে দিয়ে কেউ ঝুড়িভাজা নিয়ে গেলেই তাকে গেটে ঢুকতেই হবে। তারপর গোল প্যাকেটটি হাতের চাপে ভেঙে দিলেই সৃষ্টি হয় অজস্র টুকরো। ট্রেন যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে এক-একটা টুকরো মুখে দিয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা।

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার বাড়ি কোথায়!"

-"বাবা, আমার বাড়ি অশোকনগরে।"

-"অশোকনগরের কোথায়?"

-"তুমি কি চিনবা ভেতরের জায়গা! আমার বাড়ি ওই অশোকনগরের 3 নম্বর স্টেডিয়ামের পাশেই।"

-"সে কি! আমার বাড়িও তো অশোকনগরের কল্যাণগড় এলাকায়।"

এরপরে হঠাৎ করে যে প্রত্যুত্তরটি আমি পেলুম তার কাছ থেকে,তার জন্য সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমাকে পুরোপুরি বিস্ময়াবিষ্ট করে তিনি বললেন, "আচ্ছা,তোমার বাবার নাম কি বাবুল! মানে বাবুল দেবনাথ?"

বাক্যহারা এবং উল্লসিত হয়ে আমি বললুম, "সে কি! আপনি আমার বাবাকে চিনলেন কি করে!"

-"তোমার বাবাকে গিয়ে বলো আমার কথা। আমার নাম সুবল ঘোষ। তোমার বাবার সাথেই আমি গোলবাজারে কাঁচামাল বিক্রি করতাম। কম কষ্ট করেনি কিন্তু তোমার বাবা। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার হেঁটে ঝিকরা, দীঘিরহাট, সেনডাঙ্গা হাটে যেত কাঁচামাল কিনতে। সে কি আজকের কথা! খুব ভালো লাগছে, তুমি চাকরি পেয়েছ। তোমার বাবা-মা এখন পায়ের ওপর পা তুলে থাকবেন। খুব ভালো লাগলো বাবা তোমার ব্যবহার। যখনই অশোকনগর বাড়ি বললে, তখনই তোমার কথা স্মরণে এলো। কারণ তোমার বাবার কথা প্রসঙ্গে কোনো একদিন, বলেছিল আমার ছেলে রেলে চাকরি পেয়েছে, আর গুমাতেই পোস্টিং। আমরাও খুব গরীব পরিবারের মানুষ বাবা। লকডাউন তো আমাদের প্রায় সহায়-সম্বলহীন করে দিয়ে গেছে। সামান্য কিছু জমানো টাকা দিয়ে আর কতদিন চালানো যায় বাবা বলো! তাই ব্যাগে করে কিছু ঝুড়িভাজা নিয়ে গুমা হাটে যাচ্ছি, যদি কিছু বিক্রি হয়। তাহলে তো অন্ততঃ পেটের ভাতের কথা চিন্তা করতে হবে না। দুপুরের রোদে ক্লান্ত লাগছে বলেই তোমার এখানে বসেছিলুম। ভালো থেকো বাবা, আর বাবা-মা কে খুব ভালো রেখো। আমি টুকটুক করে এগোই তাহলে। লাইন ধরে হাটে যেতে তো এখনও প্রায় ২০-২৫ মিনিটের মতো লাগবে।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললুম, "সাবধানে যাবেন কাকা। সবসময় ট্রেনকে সামনে রেখে যাবেন। আসার পথে নাহলে স্টাফ স্পেশালেই আসবেন, অসুবিধা হবে না।"

ধূলিধুসরিত দুটি পা ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে চোখের দৃষ্টিকোন থেকে। তপ্ত রেললাইন জুড়ে মন কেমন করা গোধূলির নিস্তেজ রক্তাভ আলো। বৃদ্ধের ছায়া ক্রমশ অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হচ্ছে। যতক্ষন অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সেই পানে। অদৃশ্য হতেই চোখের কোনও যেন অজান্তে ভিজে উঠলো, জানি না কেন! কত অচেনা জিনিসই অজান্তে আমাদের আপন হয়ে যায়, তা কল্পনাও করতে পারি নে।

গেটঘরের টেলিফোনটি সশব্দে বেজে উঠে বিজাতীয় অন্যমনস্কতাকে ভেঙে খান খান করে দিলো। দৌড়ে গিয়েই রিসিভার কানে তুলতেই ভেসে আসলো, স্টেশন মাস্টারের গম্ভীর গলার স্বর। "আপে স্টাফ স্পেশাল বিড়া ছেড়েছে, আস্তে আস্তে গেট দিয়ে সিগনাল দিয়ে দেবেন।"

*(চলবে)*

---

বিপ্লব দেবনাথ। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে কর্মরত একাধারে যেমন রেলকর্মী তেমনি রেলপ্রেমী তথা প্রকৃতিপ্রেমী এবং খাদ্য রসিক। কখনো রেলে চড়ে বা কখনো রেলের কাজের ফাঁকে ফাঁকেই তার রেলপ্রেমের নানান প্রতিচ্ছবি আমরা প্রতিমুহূর্তে দেখতে পাই। শুধু ছবিতেই নয় তার বিবরণের গল্প যে কোন মানুষকেই অনায়াসে মানসভ্রমণ করাতে সম্ভব। তাই তার রেল প্রেমীর ডায়রিটির প্রতিটা পাতায় লৌহশকটের নানাবিধ গল্পের সাথে প্রকৃতির এক নিবিড় বন্ধনের গল্প শোনা যায়। রেল ক্যানভাসের এই সংখ্যায় সেই ডায়রি থেকেই বেরিয়ে এসেছে আরও একটি স্বাদ বদল করা গল্প।

*ব্যবহৃত সকল ছবি TrainTrackers archive থেকে গৃহীত ও স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত।*
*প্রচ্ছদ চিত্রগ্রাহক - সোমশুভ্র দাস।*
*অক্সিজেন এক্সপ্রেস চিত্রগ্রাহক - অর্কোপল সরকার। বাকি সকল চিত্রগ্রাহক - সোমশুভ্র দাস।*

# অতিমারির আবহে পণ্য পরিবহণ

## নবায়ন দত্ত

অতিমারি কবলিত হয়ে ২০২০-২১ সালে সারা বিশ্ব তথা অগণিত ভারতবাসীকে বহু প্রকারের সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমগ্র দেশজুড়ে লকডাউন, স্তব্ধ জনজীবন, স্তব্ধ বাণিজ্য, স্তব্ধ অর্থনীতি এবং অগ্রগতির চাকা; সামাজিক সম্পর্কটুকুও রসাতলে যেতে বসেছিল। কিন্তু এতসব কিছুর মধ্যেও নিরন্তর পরিষেবা প্রদান করে, সকল ভারতবাসীর মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার কাজটি করে গেছে ভারতীয় রেল। জনমানসে বহুলাংশের একটা ভুল ধারনা ছিল, যে সব কিছুর পাশাপাশি রেল পরিষেবাও বন্ধ ছিল, যেটা সম্পূর্ণ ভুল; কারণ ভারতীয় রেলের যাত্রী-পরিবহণ বন্ধ থাকলেও, পণ্য-পরিবহণ একটা দিনের জন্যও বন্ধ ছিলো না। এইসূত্রে আসা যাক একটা বহুল প্রচলিত প্রশ্নে এবং তার সমাধানে রেলের বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপের আলোচনায়। প্রশ্নটা ছিলো – 'লকডাউনে যাত্রীপরিবহণ বন্ধ থাকায় ভারতীয় রেল কতটা ক্ষতির সম্মুখীন'? এর উত্তর পেতে গেলে প্রথমে জানতে হবে ভারতীয় রেল কি, রেলের আয় কিসে, মোট কত রকম ভাবে ভারতীয় রেলের কোষাগার ভরে?

রেল প্রধানত দুরকম ভাবে আয় করে থাকে - ১) ভাড়াবাবদ আয় ২) ভাড়াব্যাতীত আয়। এই বার ভাড়াবাবদ আয় কে দুটি অংশে ভাগ করা যায়, ১) পণ্য পরিবহণ থেকে আয় ২) যাত্রী পরিবহণ থেকে আয়। এইবার যদি সবকটি বিভাগ থেকে আয়ের শতাংশে হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যায় পণ্য থেকে আয় ৬৫%, যাত্রী থেকে আয় ৩০% এবং বিবিধ খাতে আয় ৫%। প্রতিটা আর্থিকবর্ষে ভাড়া বাবদ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রেলবোর্ড দ্বারা প্রতিটা জোনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ প্রতিটা জোনকে সেই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হয়। কিন্তু করোনা আবহে ২০২০-২১ এর ৯৫% শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়া কিন্তু কোনো মতেই সম্ভবপর ছিল না। কারণ শুধু পণ্য খাতে ৬৫% টার্গেট পূরণ হওয়া মানে এই নয় যে রেলের আয় সঠিক মাত্রায় আছে। যাত্রী পরিবহণের ৩৩% নেহাতই কম নয় যেখানে এক একটা শতাংশ অনেকটাই বড় পরিমাপ বহন করে।

অতএব, এটা বলাই যায় যে যাত্রী খাতে রেল ওই সময় লোকসান বহন করেছে। ফলে পণ্য পরিবহণের উপরই টিকে ছিল ২০২০-২১ এর ভাড়া বাবদ আয়ের লক্ষ্যমাত্রার কাছে পৌছনোর আশা। সেক্ষেত্রে পণ্য পরিবহণের ৬৫% শতাংশ তো পুরণ করতেই হতো, তার সাথে যাত্রী খাতের কমতিটাকেও যতটা পারা যায় মিটিয়ে ফেলার অতিরিক্ত চাপও ছিল। এইসব কিছুর জন্যই দরকার ছিল একটা সুপরিকল্পিত ও বাস্তবসম্মত পণ্য শুল্ক নীতি। সেটি নির্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়িত করতে রেল উঠে পড়ে লাগে।

ভারতীয় রেলের ইতিহাসে সেই প্রথমবার, ফিল্ড লেভেলের আধিকারিকদের নিয়ে প্রতিটা জোনের CFTM বা মুখ্য পণ্য পরিবহণ আধিকারিকের নেতৃত্বে, প্রতিটা ডিভিশনের Sr. DOM বা সিনিয়ার ডিভিশনাল অপারেশনস্ ম্যানেজারদের নিয়ে গড়ে ওঠে বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট বা BDU। প্রতিটা জোনের পণ্য পরিবহণের কর্মক্ষমতা, নতুন গ্রাহকদের রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণে আকৃষ্ট করা ও সাহায্য করা, গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা, এবং তাদের চাহিদা পুরণের সমস্ত দায়িত্ব থাকে এই টিমগুলির উপর। এছাড়াও ঘাটতি মেটাবার জন্য রেল বোর্ডের আরো কিছু পণ্য পরিবহণ নীতি ও পদক্ষেপ যথেস্ট উল্লেখযোগ্য। সেগুলিরই কিছু প্রধান দিক নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক;

মাঝারি ও ছোটো ব্যাবসায়ীদের রেলমুখি করবার উদ্দেশ্যে ওয়াগন লেভেল ইন্ডেন্টিং এর সুবিধা রেল ইতিমধ্যেই চালু করেছে। এতে যে সব ব্যবসায়ী খরচের ভয়ে তাদের

প্রচ্ছদ চিত্র - সোমশুভ্র দাস

তুলনামূলক স্বল্প পরিমাণ পণ্য পরিবহণের জন্য সড়ক পথ ব্যবহার করতেন, তাদের জন্য ভারতীয় রেল পণ্যের টনেজ অনুসারে ইচ্ছেমত ওয়াগন বুকিং করার সুবিধা নিয়ে আসে, যার ফলে কাউকে গোটা ট্রেন লোড বুকিং আর করতে হবে না।

সেই সময়ের কঠিন পরিস্থিতির জন্য গোটা দেশে নিয়মিত যাত্রী পরিষেবা বন্ধ থাকার দরুন ভারতীয় রেলের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ছিল মেগা ব্লক নিয়ে সেই সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, মেরামতি ও পরিবর্ধন করে ফেলা যাতে পণ্যবাহী পরিষেবা পূর্ণগতিতে চলাচল করতে পারে, অর্থাৎ রেলপথ সংক্রান্ত কোনো বাধ্যবাধকতা যেন তার গতি রোধের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। ফলে একটা টার্মিনাল থেকে সফল ভাবে লোডিং এবং গন্তব্যে দিয়ে আনলোডিং হওয়ার মাঝের সময়টা অনেকটাই কমে যায়, এবং ডিভিশনগুলোর Wagon Turn Around টাইমও (একটা ওয়াগন লোডিং হওয়া থেকে পুনরায় লোডিং এর জন্য উপযুক্ত হবার সময়কাল) কমে যায়, ফলে কম সময়ের মধ্যে বেশি করে লোডিং করিয়ে উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় রেল।

মেরি-গো-রাউন্ড ব্যবস্থাকে কিছুটা অনুকরণ করে, রাউন্ড ট্রিপ ট্র্যাফিক নীতিকে পরিশোধন করে গ্রাহকদের কাছে বেশি করে উপলব্ধ করা, ভারতীয় রেলের একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ! কারণ, এমনিতে মেরি-গো-রাউন্ড ব্যবস্থা গ্রহন করতে গেলে গ্রাহককে রেলের অনেক নীতি মেনে চলতে হয় এবং সেটা অনেকটাই খরচ সাপেক্ষ ছিল। পূর্ব উপকূল রেলওয়ের (ECoR) মহানদী কয়লাখনি এবং তালঝাড়ি পাওয়ার জেনারেটিং স্টেশনের মধ্যে এই প্রক্রিয়ায় কয়লা পরিবহণ হয়। কিন্তু ওইসব নীতি-নিয়ম এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। তার বদলে জানা যাক কিভাবে এই রাউন্ড ট্রিপ ট্র্যাফিক ব্যবস্থার সরলীকরণ করার ফলে রেল এবং গ্রাহক উভয়পক্ষই উপকার পাচ্ছে! রেল, চুক্তি অনুসারে, প্রতি মাসে দু-তরফ থেকেই একটা নির্দিষ্ট হারে ইন্ডেন্ট পাচ্ছে; কারণ, এই চুক্তি অনুসারে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে রেকের ব্যাক-লোডিং উপলব্ধ থাকে, ফলে একটা সফল আনলোডিংএর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সেই একই রেক একই সাইডিং থেকে পুনরায় লোড হতে পারছে, ফলে ওয়াগনের Empty Run (খালি অবস্থায় যাতায়াত) হ্রাস পাচ্ছে। এবার গ্রাহকদের দিকটা দেখা যাক। রেলের জটিল রেক-বন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সম্মক ধারনা ব্যবসায়ী মাত্রই থাকে বিশেষতঃ যারা নিয়মিত রেলে পণ্য পরিবহণ করিয়ে থাকেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময় মত লোডিং-আনলোডিং হবার পুর্ণ নিশ্চয়তা পেয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

আবার আসা যাক ভারতীয় রেলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনায় যা হলো – Freight Incentive Scheme! যার মধ্যে অন্যতম হল, Own Your Wagon Scheme (OYWS) এবং Wagon Investment Scheme (WIS)। যেগুলির আওতায় বিভিন্ন বেসরকারি পণ্য পরিবহণ সংস্থাগুলি তাদের লিজ নেওয়া ওয়াগন সমূহ, ভারতীয় রেলে খাটিয়ে, নিজেদের আয় ঘরে তুলছে। প্রশ্ন হলো যে এতে রেলের লাভ কোথায়? তাহলে বলতে হয়, এক নয় একাধিক ধরনের শুল্ক সেইসব বেসরকারি সংস্থাগুলি বিভিন্ন খাতে ভারতীয় রেলকে প্রদান করে থাকে। সে সমস্ত শুল্কগুলি সম্পর্কে সবিস্তার বিবরণ অন্য একটি লেখনীতে দেওয়া হবে। কিন্তু ওর মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য একটি শুল্ক নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন তা হলো - Stabling Charges; এই শুল্ক তখনি চাপানো হয় যখন, কোনো বেসরকারি সংস্থার ওয়াগন/রেক ভারতীয় রেলের পরিসরকে (সাইডিংকে) লোডিং, আনলোডিং এর জন্য ব্যবহার করে। রেল এর জন্য ওয়াগন/প্রতি এবং দিন/প্রতি অনুসারে একটা শুল্ক আদায় করে থাকে। ২০২০ সালের মাঝামাঝি চলতে থাকা অতিমারীর কারণে এই ব্যবস্থায় কয়েক মাস ব্যাপী সাময়িক ছাড়ের কথা ঘোষণা করে রেলবোর্ড। সেইমত বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বেশ কিছু মাস Stabling Charges বাবদ কোনো শুল্ক রেলকে না দিয়েই রেলের সাইডিং ব্যাবহার করার ছাড়পত্র পায়। করোনা আবহে গ্রাহকদের পরিষেবা গ্রহণে উৎসাহিত করতেই রেলের সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

দুরত্ব ও পরিমান, এই দু'টি জিনিষ হল পণ্য পরিবহণের মূল সূচক। এই দুই সূচককে কাজে লাগিয়ে নিট টন কিলোমিটার বা NTKM পরিসংখ্যান মাপা হয়ে থাকে। একটি ট্রেন তার লোডিং ক্ষমতার পূর্ণ সীমায় লোডেড হয়ে যত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে

ছবি - সোমশুভ্র দাস

সক্ষম, সেই টেন তত বেশি অর্থ-উপার্জনে সক্ষম। এই দুরত্ব এবং পরিমানের সম্মিলিত গুনফল হল নিট টন কিলোমিটার! এর ভিত্তিতে ট্র্যাফিককে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ১) শর্ট লিড ট্র্যাফিক এবং ২) লং লিড ট্র্যাফিক। সাধারণ ভাবে ০ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যের ট্র্যাফিক বুকিংকে ধরা হয় শর্ট লিড ট্র্যাফিক। আর, ১০১ থেকে অধিক কিলোমিটারের বুকিংকে লং লিড ট্র্যাফিক ধরা হয়ে থাকে। অতিমারীর কারণে ভারতীয় রেল, পণ্য অনুসারে প্রতিটা কিলোমিটার স্ল্যাবে প্রতিটা ট্র্যাফিক বুকিংএ আলাদা আলাদা শতাংশে শুল্ক ছাড় ঘোষণা করে। বিশেষ করে শর্ট লিড ট্র্যাফিককে বেশি করে উৎসাহিত করতে তাতে তুলনায় বেশি ছাড় দেওয়া হয়। শর্ট লিড, ৫০ কি.মি অবধি ট্র্যাফিক বুকিংয়ে এবং লং লিডে লোহা আকরিকের ১৭০০+ কি.মি বুকিংয়ে সবচেয়ে বেশি ছাড় দেওয়া হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, এমত পরিস্থিতিতে রেল শর্ট লিডে বেশি পরিমানে NTKM না জোগাতে পারলেও, লং লিডের মাধ্যমে তা জোগাতে সক্ষম এবং পরবর্তীকালে লং লিড ট্র্যাফিকেও আরো বেশি বুকিং জোগাতে শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থা করে রেলবোর্ড।

গ্রাহক-সন্তুষ্টি এখন ভারতীয় রেলের মুল মন্ত্র। সেই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে, সমস্ত রেকের লোডিং-আনলোডিং এর ফ্রি-টাইম বৃদ্ধি করে রেল! এই হেডলাইনটা তখন বেশ প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এই ফ্রি-টাইমের ব্যাপারে কিছু তথ্য। রেলবোর্ডের ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টের Commercial Traffic Rate বিভাগ দ্বারা জারি করা Rates Master Circular এ সমস্ত মালবাহী রেকের লোডিং-আনলোডিং করবার একটা সময় বেধে দেওয়া আছে। যেমন, BCN রেকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি টাইম ৯ ঘন্টা দেওয়া আছে, তেমনি কয়লা বহনকারী হপার বা BOXN রেকের আনলোডিং টাইম সবচেয়ে কম ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট দেওয়া আছে। এইসময় সীমা অতিক্রম করলেই গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ শুল্ক গুনতে হয়। কিন্তু, মাঝে রেলবোর্ড দ্বারা বিবৃতি জারি হয় যে, গ্রাহকদের সুবিধার জন্য এই ফ্রি-টাইম আরও কিছুটা বাড়ানো হল। এতে রেলের কিন্তু সরাসরি কোনো লাভ হলো না, উল্টে সেই রেকের WTR এর দিনসংখ্যা বাড়তে চলেছিল। কিন্তু যেহেতু গ্রাহক-সন্তুষ্টি এখন রেলের মন্ত্র; গ্রাহকসন্তুষ্টি বাড়লে স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য খাতে মুনাফা ঘরে আসবে এটাই মনে করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তার বাস্তব প্রতিফলনও দেখা গেছিল।

যেসব গ্রাহকেরা কম পরিমান পণ্য, তুলনামূলক কম খরচে রেলের মাধ্যমে পরিবহণ করাতে চায়, তাদের জন্য ২০০৫ সালে রেলবোর্ড একটি বিশেষ পরিবহণ মাধ্যমের উদ্ভাবন করেছিল, যেটা মিনি রেক নামে পরিচিত। এটির বিশেষত্ব হলো, এরকম রেকে গ্রাহকরা তাদের মালপত্র বুকিং করালে, তারা ট্রেন লোড এর সুবিধা পাবে। প্রশ্ন হলো, কি এই ট্রেন লোড? রেলবোর্ড দ্বারা যখন কোনো ওয়াগনের অনুমোদন দেওয়া হয়, তখন একটা ট্রেনে সর্বাধিক কটা ওয়াগন থাকতে পারে, তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যেমন, BCN রেকে ৪২ টা ওয়াগন থাকতে পারে, BOXN রেকে ৫৯ টা ওয়াগন থাকতে পারে। এই গেলো ট্রেন লোডের অপারেটিং দিকটি। এইবার আসা যাক Commercial বা ব্যবসায়িক দিকটি। তাতে বলা হয়েছে, যদি কোনো গ্রাহক সবকটি ওয়াগন অথবা এক-দুটি ওয়াগন বাদ রেখে গোটা ট্রেনটি বুক করে তাহলে সে Base Freight Rate এর

উপর একটি আকর্ষনীয় ছাড় পাবে। এর আগে অবধি, যদি কোনো গ্রাহক ৫৯টির জায়গায় ৫৩টি ওয়াগন বুক করতো, তাহলে সে ছাড়তো পেতই না, বরং তার বুকিংকে ট্রেন লোডের আওতায় এনে সেইমত শুল্ক আদায় করা হতো। ফলে, এক্ষেত্রে রেলের লাভ এবং গ্রাহককে বাড়তি পয়সা গুনতে হতো। তাই গ্রাহকদের এই অসুবিধাকে কিছুটা দূর করবার জন্য রেলবোর্ড এই মিনি রেকের সুবিধা নিয়ে আসে। অবশ্য শুধুমাত্র সেইসব গ্রাহকরা মিনি রেকের সুবিধা পেয়েছে, যারা BCN এর মাধ্যমে তাদের পণ্য পরিবহণ করিয়েছে। এই ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ২০টি ওয়াগন বুক করা যায় এবং ওই রেকটিকে ট্রেন লোড এর সুবিধাও দেওয়া হয়। এবং এরপরে রেলবোর্ড নতুন বিবৃতি জারি করে ১৫০০ কি.মি অবধি মিনি রেক বুক করার সংস্থান রাখার কথাও ঘোষণা করে। সাধারণত মিনি রেক ৪০০ কি.মি এর বেশি দূরত্ব অতিক্রম করার সংস্থান ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করে রেলবোর্ড এই ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে!

আমাদের প্রতিবেশী যে দেশগুলির সাথে আমাদের রেল সংযোগ আছে তারা হলো, বাংলাদেশ, পাকিস্তান (বর্তমানে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্থগিত) ও নেপাল! এইসব দেশে কি কি পণ্য কোন কোন রেকের দ্বারা পরিবহণ করা হয়ে থাকে সেটা এক নজরে যাকঃ- নেপালে BLC, BLL এবং BFK ওয়াগন দ্বারা ইনল্যান্ড কন্টেনার পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে, BOXN এবং CONCOR ওয়াগনে যথাক্রমে কয়লা ও আয়রন/স্টীল, আর BCN ওয়াগনে সিমেন্ট, খাদ্য ও সার পরিবহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু হালে ভারতীয় রেলের ইতিহাসের প্রথম আন্তর্জাতিক ভাবে অটোমোবাইল রেকের মাধ্যমে চার চাকার গাড়ীও পরিবহণ করা হয়। বাংলাদেশের সাথে ভারতের রেল সংযোগ বহুকালের পুরোনো। সারা বছর ধরে BCN ও BOXN রেকে করে নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন সাইজের পাথর ও পাথরকুচি ওই দেশে পরিবহণ করা হয়। পরে করোনাকাল থেকে BCN ওয়াগনে করে সেদ্ধ চালও পরিবহণ করা চালু হয়। সম্প্রতি, রেলবোর্ড বাংলাদেশের সাথে কন্টেনার ট্র্যাফিক, Parcel এক্সপ্রেসে করে শুকনো লংকা, আদা ও হলুদ ট্রান্সপোর্ট ও NMG রেকে করে অটোমোবাইল ট্র্যাফিকেরও সূচনা ঘটিয়েছে। এছাড়াও, এই দেশকে PSC রেলওয়ে স্লিপার এক্সপোর্ট করা হয় রেলের মাধ্যমে।

কোভিড মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে দেখা দেয় অক্সিজেনের তীব্র অভাব। বিদেশ থেকে Liquid Medical Oxygen আমদানী করা হলেও এটা দেখা যায় যে দেশের স্টীল প্ল্যান্টগুলিতে যত পরিমান LMO মজুত আছে তাতে যে কোনো সংকটজনক পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যেতে পারে। দরকার ছিল একটা সুষ্ঠ এবং দ্রুত পরিবহণ ব্যবস্থা যা এই চাহিদা পূরণ করতে পারবে। এই সমস্যাটি দূর করবার তাগিদ নিয়ে যৌথ উদ্যোগে এগিয়ে আসে CONCOR এবং ভারতীয় রেল। মূলত দু-রকম পদ্ধতিতে LMO পরিবহণ শুরু হয় রেলের মাধ্যমে। ১) Ro-Ro বা Roll-on Roll-off পদ্ধতিতে BRN, BOM/DBKM ওয়াগন ব্যবহার করে, যেখানে রেলের Red

ছবি - সোমশুভ্র দাস

ছবি - সোমশুভ্র দাস

Tariff অন্তর্ভুক্ত LMO কে LR3 রেটে ধার্য করা হয়েছে এবং ২) CTO (Container Train Operators) দের BLC/BLA ওয়াগনে Cryogenic ট্যাংকারে পরিবহণের মাধ্যমে।

সাধারণত ভারতীয় রেল CTO দের থেকে নির্দিষ্ট কিছু শুল্ক আদায় করে যেমন, Hauling Charges, Terminal Access charges, ইত্যাদি। কিন্তু বৃহত্তর মানবিকতার স্বার্থে রেল ঘোষণা করে যে, LMO পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনরকম শুল্ক ধার্য করা হবে না। পরবর্তীকালে এই অক্সিজেন একপ্রেস শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই নয়, সীমানা ছাড়িয়ে তা পৌছে গেছে প্রতিবেশী বাংলাদেশেও। এখনো অবধি অক্সিজেন এক্সপ্রেস, Empty এবং Full Load মিলিয়ে, মোট ৯০০টি ট্রিপ সম্পূর্ণ করেছে, যার মধ্যে প্রথম খালি রেকটি মধ্য রেলওয়ের কালালি গুডস শেড থেকে বিশাখাপত্তনম স্টিল প্ল্যান্ট অবধি যাত্রা করে এবং সেই রেকটিই লোড হয়ে প্রথম লোডেড অক্সিজেন এক্সপ্রেস হিসাবে নাসিক রোডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে! বাংলাদেশে ভারতীয় রেল ২০২১ সালে ১৬টিরও বেশি অক্সিজেন এক্সপ্রেস পাঠিয়েছে।

এছাড়াও, অতিমারি পরিস্থিতিতে ভারতীয় রেল দ্রুত ও নিরন্তর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে, উত্তর ভারতের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে 'অন্নপূর্ণা' এবং দক্ষিণ ভারতের কৃষিপ্রধান অঞ্চলে 'জয় কিষাণ' নামের দুটি Super Fast Parcel Express চালু করে।

দেশের লাইফলাইন উপাধি পাওয়া ভারতীয় রেলের তরফে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি আক্ষরিক অর্থে অতিমারি কবলতি দেশের জন-জাতির জন্য ফলপ্রসূ এবং জীবনদায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের নাগরিক এবং সমস্ত রেলপ্রেমীদের তরফ থেকে, সংকটপূর্ণ সময়ে ভারতীয় রেলের গুরুত্বপূর্ণ, সুপরিকল্পিত, সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত নীতিগুলিকে কুর্নিস জানানো হচ্ছে।

*সমস্ত মতামত লেখকের ব্যক্তিগত। আলোচিত সমস্ত তথ্য বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে।*

ছবি - সোমশুভ্র দাস

# রক্তিম ভট্টাচার্য

সন - ২০০০

ছেলেটি অবাক হয়ে দেখছিল খয়েরি-হলুদ রঙের ইঞ্জিনটি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেই চিরাচরিত "ঘট-ঘট-ঘট-ঘট" শব্দ করে এগিয়ে আসছিল প্রান্তিক স্টেশন ছেড়ে লেভেল ক্রসিং টির দিকে। সে জানে রেলের এই ধরনের ইঞ্জিন গুলি ডিজেল চালিত এবং অবৈদ্যুতিক; আর এই ধরনের ইঞ্জিনগুলিই তার সবচেয়ে প্রিয়। সে তার দাদুর বাড়ি এলেই প্রত্যেক দিন বিকেলে লেভেল ক্রসিংএ আসে, বিকেলের বর্ধমান প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি এবং সঙ্গে তার প্রিয় ইঞ্জিনটি দেখতে। কি দারুন, প্রাণবন্ত এই ইঞ্জিনগুলি! কি মধুর এই আওয়াজ! - এই আলতো মৃদু থেকে ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা, ট্রেনটি চলে যাওয়ার পরেও ভেসে আসে দূর থেকে - শুনে ছোট্ট ছেলেটি এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে হারিয়ে যায়।

সন - ২০২৩

সেই ছোট্ট ছেলেটি এখন বড় হয়েছে - সে এখন জানে যে তার সেই ছোটবেলার প্রিয় রেল-ইঞ্জিনগুলি রেলের ভাষায় 'অ্যালকো' (ALCo বা American Locomotive Company) বলা হয়, যার অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে এবং তার মতই ভারতীয় রেলপ্রেমী আরও বহু মানুষ আছে যাদের এই অ্যালকো লোকোমোটিভ একই রকমের প্রিয় এবং আবেগের। তারই মতো আরও অনেকেই অ্যালকোর মন মাতানো আওয়াজ শোনার জন্য পাগল। ভারতীয় রেলে অ্যালকোর অবদান এখনও অবধি যেকোনো রকম লোকোর চেয়ে অনেকটাই আলাদা রকমের এবং বেশি। বাষ্পচালিত লোকোর যুগ থেকে ভারতীয় রেলকে খুব সুন্দর ভাবে ডিজেল চালিত রেল ইঞ্জিনের যুগে নিয়ে আসে এই অ্যালকো। তারপর প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় রেলকে মূলত এই অ্যালকো লোকোই এগিয়ে নিয়ে গেছে। লোকোর সংখ্যা এবং ডিউটির দিক দিয়েও অ্যালকোই ছিল ভারতীয় রেলে সর্বাধিক। প্রায় ২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রেল জুড়ে অ্যালকোর একপ্রকার একছত্র আধিপত্য চলেছে। এখন ভারতীয় রেল থেকে কালের নিয়মে এবং কিছুটা অনান্য কারণেও অ্যালকো লোকোমোটিভ বিদায় নিচ্ছে, ঠিক যেমন বাষ্পচালিত তথা ষ্টীম লোকোও বিদায় নিয়েছে। ভারতীয় রেলে বাষ্পচালিত লোকোর মত ডিজেল লোকোও থেকে যাবে সামান্য কিছু সংরক্ষিত অবস্থায় এবং বাকি এই ছেলেটির মতো রেলপ্রেমীদের মনে। যার মতো আরও অনেক রেলপ্রেমীর কাছে এই অ্যালকোর ধীর কিন্তু নিশ্চিত অবলুপ্তি যথেষ্ট কষ্টের বিষয়। তবে ছেলেটির একটি শান্তির জায়গা হচ্ছে যে সে পূর্ব রেলওয়ে অঞ্চলের অধিবাসী এবং পূর্ব রেল বর্তমানে ভারতীয় রেলের মধ্যে অ্যালকো লোকোমোটিভ পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্ত জোনের থেকে আলাদা। কেন, সেটাই এই লেখনীর আলোচ্য বিষয়।

পূর্ব রেলের অ্যালকো লোকোমটিভ নিয়ে কোনরকম আলোচনা করার আগে জেনে নেওয়া দরকার ভারতীয় রেলের ডিজেল লোকোমোটিভের রকমফের। ভারতীয় রেলে মূলত ৩ রকমের ডিজেল-ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ (বা ইঞ্জিন) ব্যবহৃত হয় -

১) অ্যালকো (ALCo) ~ এই লোকোগুলি শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান লোকোমোটিভ কোম্পানি (American Locomotive Company (ALCo) বানাতো যার থেকে এই লোকোর নামকরণ। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষেই অ্যালকোর অধীনে এবং পরে একেবারে স্বাধীন ভাবে এই লোকোমোটিভ তৈরি শুরু হয়। অ্যালকো লোকোমোটিভের অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে যার মধ্যে প্রথম WDM-1 তবে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম হচ্ছে WDM-2, যা মনে করা হয় আজ অবধি ভারতীয় রেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকোমোটিভ। বর্তমানে অ্যালকোর যে যে প্রধান শ্রেণী গুলি ব্যবহৃত হয়ে তা হলো - WDM-3A, WDM-3D ও WDS-6.

**২) ইএমডি (EMD) ~** এই লোকো গুলিও শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিএম-ইএমডি (GM-EMD) কারখানায় নির্মিত হতো এবং পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে তৈরি করা শুরু হয়। ইএমডি শুরু তে মুল চার ভাগ (WDM-4, WDG-4, WDP-4 ও WDG-5) থেকে ভারতে এসে প্রয়োজন মতো আরও শ্রেনীবিভাগ তৈরি হয় যেমন WDP-4B, WDP-4D, WDG-4D। বর্তমানে WDM-4 বাদে আর সব কটি ক্লাসই মেইনলাইন সার্ভিসে আছে।

**৩) জি ই (GE) ~** এই লোকোগুলি প্রাথমিক ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জি-ই অর্থাৎ জেনারাল ইলেক্ট্রিকের (General Electric) কারখানায় নির্মিত হতো এবং পরে তাদেরই তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে তৈরি হওয়া শুরু হয়। জি-ই তৈরী দুটি শ্রেণির লোকো ভারতে কাজ করে - WDG-4G ও WDG-6G। প্রযুক্তিগত ভাবে ভারতীয় রেলের সবচেয়ে উন্নত ও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ডিজেল লোকো WDG-6G।

যেহেতু এই আলোচনা মূলত অ্যালকো নিয়ে তাই আমরা ভারতীয় রেলে বর্তমানে চলমান মেইনলাইন অ্যালকো লোকোর কিছু প্রযুক্তিগত জিনিস স্বল্পবিস্তারে জানবোঃ

**১) WDM-3A ~** W (Wide অর্থাৎ ব্রড গেজ), M (Mixed traffic অর্থাৎ যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী দু প্রকার ট্রেন টানতেই সক্ষম), 3A ( অর্থাৎ মডেল)। এগুলি 3100HP বা ৩১০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন (পুনর্নির্মিত গুলি কিছু কিছু ৩৩০০ অশ্বশক্তি), ও সর্বাধিক গতিবেগ ১২০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। এই ইউনিটগুলি এয়ার এবং ভ্যাকুয়াম ব্রেক ছাড়াও ডুয়াল ব্রেক লাগানো হয়েছে। গিয়ারের অনুপাত 65:18। WDM-3A হল আগের WDM-2C-এর পরবর্তী শ্রেণীবিভাগ। তারা ১৯৯৪ সালে পরিষেবাতে প্রবেশ করে। ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, বারাণসীতে মোট ১৪৩+ ইউনিট নির্মিত হয়েছিল, বাকি ১২৪৬ ইউনিট WDM-2 থেকে পুনঃনির্মিত হয়েছিল যা তাদের, WDG-4 আসা পর্যন্ত, মেইনলাইন ডিজেল লোকোমোটিভের সর্বাধিক সংখ্যক শ্রেণীতে পরিণত করেছিল।

**২) WDM-3D ~** W (Wide অর্থাৎ ব্রড গেজ), M (Mixed traffic অর্থাৎ যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী দু প্রকার ট্রেন টানতেই সক্ষম), 3D (অর্থাৎ মডেল)। এগুলি 3300HP বা ৩৩০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ও সর্বাধিক পরীক্ষামূলক গতিবেগ ১৬০ কিমি প্রতি ঘণ্টা যদিও এগুলি সাধারণ ভাবে ১২০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে চলাচল করে। এদের বগি ও আন্ডারফ্রেম উন্নত করা হয়েছে হুইল স্লিপ কমিয়ে ট্র্যাকটিভ ক্ষমতা বৃদ্ধি করানোর জন্য। তারা ২০০৩ সালে পরিষেবাতে প্রবেশ করেছিল। ২০০৩ থেকে ২০১৫ এর মধ্যে ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, বারাণসীতে মোট ৫৯০টিরও বেশি WDM-3D নির্মিত হয়েছিল ।

*ছবি - অঞ্জন রায় চৌধুরী*

*ছবি - শুভদ্যুতি বোস*

**৩) WDG-3A ~** W (Wide অর্থাৎ ব্রড গেজ), G (Goods traffic অর্থাৎ পণ্যবাহী ট্রেন টানতে সক্ষম যদিও এগুলি যাত্রীবাহী ট্রেনেও ব্যবহার হয়), 3A ( অর্থাৎ মডেল)। এটি অত্যন্ত সফল WDM-2 এর ডেডিকেটেড পণ্যবাহী সংস্করণ। এগুলি 3100HP বা ৩১০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন (পুনর্নির্মিত গুলি কিছু কিছু ৩৩০০ অশ্বশক্তি) ও সর্বাধিক গতিবেগ ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। তারা ১৯৯৫ সালের ১৮ জুলাই থেকে পরিষেবা দিতে চালু করে। ডিজেল লোকো মডার্নাইজেশন ওয়ার্কস (DLMW) এবং প্যারেল ওয়ার্কশপ দ্বারা উৎপাদিত কয়েকটি ইউনিটের সাথে ১৯৯৪ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে, বারাণসীর ডিজেল লোকো ওয়ার্কসে, ১১৬৪টি WDG-3A লোকো তৈরি করা হয়েছিল।

এবারে আসা যাক পূর্ব রেলের বৃত্তান্তে। পূর্ব রেলের ডিজেল লোকো শেড আছে ৫টি, যার মধ্যে প্রত্যেকটিতেই অ্যালকো লোকো রাখা হয়। এগুলো হল অণ্ডাল, বর্ধমান, জামালপুর, হাওড়া ও বেলেঘাটা। এর মধ্যে বেলেঘাটা লোকো শেডে শুধু মাত্র শান্টিং অর্থাৎ WDS-6R লোকোমোটিভ আছে, কোনও মেইনলাইন লোকো নেই।

আমরা এক একটি লোকো শেডের ব্যাপারে আরও বিস্তারে জানবো; তাদের অ্যালকো লোকো হোল্ডিং (শ্রেণী ভিত্তিক লোকোর সংখ্যা) ও তাদের কর্মক্ষেত্রও দেখে নেবো এক নজরেঃ

**১) অন্ডাল ~** অণ্ডাল পূর্ব রেলওয়ের বৃহত্তম ডিজেল লোকো শেড; বর্তমানে অন্ডালের অধীনে রয়েছে ৭০টি WDG-3A, ৬টি WDM-3A ও কিছু WDS-6R। অন্ডালের লোকোমোটিভ পণ্যবাহী (পণ্যবাহী) এবং যাত্রীবাহী উভয় ট্রেনই টানে যদিও করোনা ও

*ছবি - সোমশুভ্র দাস*

ছবি - সোমশুভ্র দাস

ছবি - রুদ্রনীল রায় চৌধুরী

লকডাউনের পরে এখন অন্ডালের যাত্রীবাহী ট্রেনের ডিউটি অনেকটাই কমেছে। পণ্যবাহী ডিউটিতে অবশ্যও কিছুটা হলেও আগের মতনই আছে অন্ডালের ডিউটি। আগের মতনই এখনও পণ্যবাহী নিয়ে পূর্ব রেল থেকে মূলত উত্তর পূর্ব-সীমান্ত রেল এবং সেখান থেকে সমগ্র ভারতীয় রেলেই অন্ডালের লোকোগুলিকে পণ্যবাহী ট্রেন টানতে দেখা যায়। আসানসোল ডিভিশানে বিবিধ শান্টিং ডিউটিতেও অণ্ডালের লোকো দেখা যায়।

**২) হাওড়া ~** হাওড়া ডিজেল শেডের বর্তমান অ্যালকো হোল্ডিং ২১টি WDM-3D ও ৯টি WDM-3A এবং WDS-6R। লকডাউনের আগে হাওড়ার WDM-3D ও WDM-3A যাত্রীবাহী ট্রেনের ডিউটি বেশি ও পণ্যবাহী ট্রেনে সামান্য কিছু সীমিত ডিউটি করত। করোনা-জনিত লকডাউনের পরে হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনের সমস্ত ডিজেল চালিত যাত্রীবাহী ট্রেনে হাওড়ার ডিজেল লোকো (WDM-3D ও WDP-4D) দেওয়া হয় (হাওড়া WDM-3A আর নিয়মিত যাত্রীবাহী ডিউটি করে না)। পণ্যবাহী সার্ভিসের জন্য হাওড়া, শিয়ালদহ ডিভিশনের রানাঘাটে একক WDM-3A ও WDM-3D পাঠায় এবং MUed বা জোড়া (অর্থাৎ দুটি লোকো একসঙ্গে চলবে এবং যেকোনো একটি লোকো থেকে নিয়ন্ত্রন করা যাবে এমন ব্যবস্থা) করে বর্ধমান থেকে পণ্যবাহী ডিউটিতে পাঠায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল বা সময় বিশেষে তারও বাইরে। শান্টিং এর কাজে হাওড়ার লোকো হাওড়া স্টেশন এবং হাওড়া ডিভিশনের ইয়ার্ড গুলিতে কাজে লাগানো হয়।

**৩) বর্ধমান ~** এটি হাওড়া ডিজেল শেডের স্যাটেলাইট শেড হিসেবেই গন্য করা হয়ে থাকে। বর্ধমানের এখন শুধুমাত্র WDM-3A আছে যার সংখ্যা ৪৬ - এবং এখন এগুলো

ছবি - অঞ্জন রায় চৌধুরী

মূলত পণ্যবাহী ট্রেন টানার কাজে ব্যবহার করা হয়। কিছু ব্যবহৃত হয় হাওড়া ডিভিশনের শান্টিং এর কাজে। পূর্বে বর্ধমানের প্রায় সমস্ত (৮০%) লোকোই শিয়ালদহ ডিভিশনের যাত্রীবাহী ট্রেন এবং পণ্যবাহী ডিউটিতে লাগানো হতো পরে যা বদলে যায়। এই বদলের বিষয়ে আরও বিস্তারে পরে দেখে নেবো।

**৪) জামালপুর ~** এটি মালদা ডিভিশনের একমাত্র ডিজেল শেড এবং এর বর্তমান অ্যালকো হোল্ডিং বলতে ২২টি WDM-3A ও একটি WDM-2 এবং কিছু WDS-6R। জামালপুর ডিজেল শেড আগে মালদা ডিভিশনের বিশাল সংখ্যক যাত্রীবাহী ট্রেনে লোকো দিতো কিন্তু ধীরে ধীরে মালদা ডিভিশন বৈদ্যুতিকরণ হয়ে যাওয়াতে সেই ডিউটি কমে গেছে অনেকটাই। এখন জামালপুর কিছু লোকো পণ্যবাহী ট্রেন ও কিছু সামান্য যাত্রীবাহী ট্রেনে খাটায়। মালদা ডিভিশনের শান্টিং এর কাজেও ব্যবহৃত হয় জামালপুরের অ্যালকো লোকো।

**৫) শেলিয়াঘাটা ~** এই শেড শুধুমাত্র শান্টিং লোকোমোটিভ অর্থাৎ WDS-6R রাখে এবং এটা থেকে হয়তো পাঠক কিছুটা আন্দাজ করে নিতে পারে এই শেডের ডিউটির ধরন। শিয়ালদহ, কলকাতা স্টেশন এবং শিয়ালদহ ডিভিশন জুড়ে সমস্ত ইয়ার্ড এই শান্টিংএর কাজে ব্যবহার হয় বেলেঘাটার লোকো এবং মেইনলাইন ডিউটি করানো যায় না এদের লোকোমোটিভ দিয়ে। এদের কর্মজীবন কতদিনের তা পুরোপুরিই ধোঁয়াশায়ে ভরা। কাজেই এই শেডটিকে আপাতত আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

এই গেল একে একে পূর্ব রেলের ডিজেল শেড গুলির কথা। পূর্ব রেলের ডিজেল

ছবি - অনমিত্র বোস

লোকোর মূল পণ্যবাহী ডিউটি থাকে পূর্ব রেল থেকে সাহেবগঞ্জ লুপ (খানা-বারহারওয়া) হয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্তগামী পণ্যবাহী ট্রেনে। এবার জানা যাক, করোনা পূর্বে এবং করোনা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রেলের অ্যালকো লোকো ব্যবহারের ধরন এবং তার পরিবর্তন।

২০১৮ সালে ভারতীয় রেল সিদ্ধান্ত নেয় ১০০% বৈদ্যুতিকরণের। এরপর একে একে স্বাভাবিক পদ্ধতি যেমন অতি বয়স্ক (ত্রিশোর্ধ) অ্যালকো লোকো ডিউটি থেকে তুলে নেওয়া ইত্যাদি এমন কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে থাকে, যাকে বলা যেতে পারে ভারতীয় রেল থেকে অ্যালকো লোকো সরানোর এক প্রথম পদক্ষেপ। তবে এই সিদ্ধান্তগুলি যথেষ্ট প্লান মাফিক এবং অ্যালকো লোকোমোটিভের স্বাভাবিক বিলুপ্তিকরণই বলা যায়। এই সময়ে ভারতীয় রেল অ্যালকো লোকো ভালো ভাবেই ব্যবহার করছিল এবং তা ইএমডি লোকোর সমতুল্যই ছিল। কিন্তু এই অতিমারি সাধারণ মানুষ সহ ভারতীয় রেলের অ্যালকো লোকোগুলির জন্যও মারণপ্রায় প্রমাণিত হতে থাকে। কারণ এই সময় সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ থাকার ফলে, এবং দীর্ঘ সময় ধরে লাইন ফাঁকা পাওয়ার সুযোগে, রেল বৈদ্যুতিকরণের কাজ দ্রুত গতিতে এগোতে থাকে ও কোনও কোনও শাখায় সম্পূর্ণও করে ফেলে। যার ফলে সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় রেলে ডিজেল লোকো ব্যবহারের প্রয়োজন/চাহিদা কমে এবং তার মূল কোপ গিয়ে পড়ে অ্যালকোর ওপরেই। অধিকাংশ জোন অ্যালকো লোকো ব্যবহার কমিয়ে দেয়। ডিউটি অনুপাতে অতিরিক্ত ডিজেল লোকো হয়ে যাওয়ার কারণে এবং অ্যালকো লোকো প্রযুক্তিগত ভাবে সবচেয়ে কম উন্নত হওয়ার কারণে এদেরকেই সবার আগে ডিউটি থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফলস্বরূপ দেখা যায়, যখন ২০২০ র মাঝামাঝি সময় থেকে ধীরে ধীরে যাত্রীবাহী ট্রেন আবার চলা শুরু হতে থাকে, তখন বহু ট্রেন বৈদ্যুতিক লোকো নিয়ে চলাচল শুরু করেছে। যেই কারণে প্রচুর ইএমডি লোকোও তাদের ডিউটি হারায় কিন্তু ইএমডি লোকোগুলি তুলনামূলক ভাবে নতুন এবং আধুনিক হওয়ার কারণে অনেক ডিজেল চলিত যাত্রীবাহী ট্রেনেই অ্যালকো লোকো দেওয়ার পরিবর্তে ইএমডি দেওয়া শুরু হয়। এবার পড়ে থাকা অ্যালকো লোকোগুলোকে কিছু কিছু জোন আর নতুন কোন ডিউটি না দিয়ে একেবারে বসিয়ে দেওয়া শুরু করে - প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ও পশ্চিম-মধ্য রেলওয়ে (যাদের প্রায় ১০০ শতাংশ লাইন বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হয়ে এসেছিল) কাজেই তারা অ্যালকো লোকো প্রায় পুরোপুরি ভাবেই মেইনলাইন সার্ভিস থেকে তুলে নেয়।

আবার কিছু জোন তাদের অ্যালকোগুলিকে একে একে যাত্রীবাহী ট্রেনের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে ওগুলিকে পণ্যবাহী ট্রেনের দায়িত্ব দিতে থাকে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পূর্ব রেলওয়ে, পূর্ব-তট রেলওয়ে ও দক্ষিন-মধ্য রেলওয়ের মতো কিছু জোন তাদের বিপুলাংশ বৈদ্যুতিকরণ হয়ে যাওয়া সত্তেও নিজেদের অ্যালকো লোকো কিন্তু ভালো ভাবেই ব্যবহার করে যেতে থাকে। আমাদের আলোচনা যেহেতু পূর্ব রেলওয়ে সংক্রান্ত তাই আমরা আরও বিস্তারে পূর্ব রেলওয়ের অ্যালকো লোকোর ডিউটির সম্বন্ধেই দেখব।

যদিও করোনা পরবর্তী প্রেক্ষাপটে পূর্ব রেলওয়েতেও লক্ষ্য করা যায়, যে কিছু যাত্রীবাহী ট্রেন ডিজেলের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক লোকো ও কিছু ট্রেন অ্যালকোর পরিবর্তে ইএমডি পেতে শুরু করে। এই সময়ে সামগ্রিক ভারতীয় রেলওয়েতে অনেক ডিজেল শেডেও বৈদ্যুতিক লোকো রাখা শুরু হয়; পূর্ব রেলও এর থেকে বাদ যায় নি। বর্ধমান ডিজেল শেডের বৈদ্যুতিকরণ করিয়ে সেখানে বৈদ্যুতিক লোকো (WAG-9) রাখা শুরু হয়। হাওড়া এবং মালদা ডিভিশনের বিস্তীর্ণ এলাকা বৈদ্যুতিকরণ এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলেও বৈদ্যুতিকরণ ভালো গতি পাওয়ায় যাত্রীবাহী ট্রেনে সামগ্রিক ভাবে অ্যালকো দেওয়ার প্রয়োজন অনেকটাই কমে। সবার প্রথম এর প্রভাব পরে অণ্ডাল ডিজেল শেডের ওপর; অণ্ডালের কাছে হাতে গোনা কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেনের দায়ীত্ব পড়ে থাকে। যেখানে আগে দক্ষিণ/পশ্চিম ভারত থেকে আসা উত্তর-পূর্বগামী প্রচুর যাত্রীবাহী ট্রেন দুর্গাপুর থেকে অণ্ডালের লোকো নিয়ে যেত, তা শুধু একটা ট্রেনে গিয়ে দাঁড়ায়। অণ্ডালের সঙ্গে সঙ্গে জামালপুর শেডের ওপর থেকেও যাত্রীবাহী ট্রেনের দায়ীত্ব অনেকটাই কমে যায় যেহেতু মালদা ডিভিশনের অধিকাংশ জায়গায় বৈদ্যুতিকরণ শেষ হয়। তুলনামূলক ভাবে হাওড়া ও বর্ধমান ডিজেল শেডের লোকোর দায়ীত্বপ্রাপ্তিতে অতিমারি আসার আগে ও ঠিক পরে

*শিয়ালদাহ ডিভিশনে বর্ধমান অ্যালকো যুগের শেষ দিকে তেভাগা এক্সপ্রেস নিয়ে।* *ছবি - রক্তিম ভট্টাচার্য*

পরে খুব একটা পরিবর্তন দেখা দেয় নি। বর্ধমান আগের মতই শিয়ালদহ ডিভিশনের যাত্রীবাহী ট্রেনের দায়িত্ব পেতে থাকে এবং হাওড়া দায়িত্বে থাকে হাওড়া ডিভিশনের ট্রেনগুলির।

তবে এই সময়ে একটি অভাবনীয় জিনিস লক্ষ করা যায়; শিয়ালদহ ডিভিশনের ট্রেন 'তিস্তা-তোর্সা' এক্সপ্রেসকে বর্ধমানের অ্যালকোর পরিবর্তে হাওড়ার ইএমডি দেওয়া চালু হয়! এটাই হয়তো ছিল শুরু, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আরও কিছু শিয়ালদহ ডিভিশনের যাত্রীবাহী ট্রেনে হাওড়ার লোকো (অ্যালকো, ইএমডি দুইই) দেওয়া হতে থাকে। ক্রমশ পরিস্থিতি এমন হয়ে যায় যে, ২০২১ র প্রথম এক-দু মাসের মধ্যে, শিয়ালদহ ডিভিশনের আর কোন ডিজেল চালিত যাত্রীবাহী ট্রেনে বর্ধমানের অ্যালকো দেখা যেতো না; সমস্ত ডিউটি চলে যায় হাওড়ার হাতে। বর্ধমান অ্যালকোর ডিউটি সীমিত হয়ে যায় শুধুমাত্র রানাঘাট থেকে বাংলাদেশগামী পণ্যবাহী ট্রেনে এবং ২০২১ র মাঝামাঝি সময়ে তাও পুরোপুরি ভাবে চলে যায় হাওড়ার কাছে। দেখা যায় যে, ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে শিয়ালদহ ডিভিশনে, বর্ধমান অ্যালকো তথা বর্ধমান শেডের আর কোন স্বাভাবিক ডিউটিই রইল না, যা কিনা এক বছর আগেও অকল্পনীয় ছিল।

এরই মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের বৈদ্যুতিকরণের কাজও এগোতে থাকে এবং তা নিউকোচবিহার অবধি পৌঁছে যায়। এদিকে ২০২২ 'এর মধ্যে পূর্ব রেলের আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা লাইনেও বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। যার ফলে আরও কিছু যাত্রীবাহী ট্রেন বৈদ্যুতিক হয়ে যায় এবং ডিজেল লোকো থেকে যায় হাতে গোনা কিছু ট্রেনের দায়িত্বে।

*শিয়ালদহ ডিভিশনে হাওড়ার অ্যালকো যুগের সূচনায় তেভাগার সাথে।* *ছবি - রক্তিম ভট্টাচার্য*

২০২১ র মে মাসে পূর্ব রেল একটি নোটিশ অনুসারে জানায় যে কলকাতা এলাকা থেকে ছাড়া যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিকে ধাপে ধাপে বৈদ্যুতিক লোকো লিঙ্ক দেওয়া হবে। সেই নোটিশ অনুযায়ী বলা হয় কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহার অবধি, কলকাতা-হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি নিউ জলপাইগুড়ি অবধি বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন পাবে। কুলিক এবং কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের জন্য বলা হয় তারা মালদা অবধি বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল ইঞ্জিন দুটোই নিয়ে যাবে; মালদা থেকে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন কেটে দেওয়া হবে এবং ডিজেল ইঞ্জিনটি মালদা থেকে ডিউটি শুরু করবে। কবিগুরু এবং তেভাগা এক্সপ্রেসের জন্য বলা হয় তারা রামপুরহাট অবধি বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল দুইই নিয়ে যাবে এবং সেখানে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনটি খুলে দিয়ে ডিজেল ইঞ্জিনটির ডিউটি শুরু হবে। হাওড়া-বালুরঘাট এবং কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের ক্ষেত্রেও একই উপদেশ দেওয়া হয়; তাদেরটা বলা হয় আজিমগঞ্জ অবধি করতে। এই ব্যবস্থার (যার নাম দেওয়া হয় 'পিগিব্যাক সিস্টেম') ফলে কলকাতা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে ডিজেল চালিত যাত্রীবাহী ট্রেনের বিলুপ্তি ঘটে। যদিও এই বিলুপ্তি ছিল সাময়িক। মালদা, রামপুরহাট এবং আজিমগঞ্জে ট্রেনের লোকো বদলানোর সময় এবং জায়গার অভাব ও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আবহে ট্রেন চালকের ঘাটতি; এই দুই সমস্যা হওয়ার কারণে 'পিগি ব্যাক সিস্টেম' এ চালানো ট্রেনগুলিকে তাদের সম্পূর্ণ যাত্রা পথের জন্য ডিজেলে চালাতে বলা হয়। কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস বাদ দিয়ে (শুধু ইএমডি) আর সব ট্রেনে হাওড়া ডিজেল শেডের অ্যালকো এবং ইএমডি দুটোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে পূর্ব রেলে যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিকে ডিজেল চালিত রাখতে একেবারেই ইচ্ছুক নয়।

এরপর হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকের মনে হবে যে পূর্ব রেলে, যেখানে ডিজেল চালিত ট্রেনের প্রতিই অনিহা রয়েছে, সেখানে অ্যালকো লোকোমোটিভের গুরুত্ব আরও বেশি কমে আসবে এবং হয়তো এও হতে পারে ভারতীয় রেলের অন্যান্য জোন গুলির মতো পূর্ব রেল ও তাদের অ্যালকো লোকোগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহার কমিয়ে দেবে আস্তে আস্তে। লেখকেরও এই একের পর এক ঘটে যাওয়া ঘটনা দেখে একই জিনিস মনে হয়েছিল।

**কিন্তু এখানেই পূর্ব রেল ভারতীয় রেলের বাকি প্রায় সব রেল জোনের থেকে আলাদা!**

পূর্ব রেলে এরকম আকস্মিক ভাবে অ্যালকোর বিলুপ্তি বা ডিউটির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া-কোনটাই ঘটে নি। কেন এবং কি ভাবে এবারে বিস্তৃত ভাবে আমরা সেটাই জানবো।

পূর্ব রেল এক দিকে যেমন যাত্রীবাহী ট্রেনে ডিজেল লিঙ্কের পরিমাণ কমাতে শুরু করে, তেমনই জামালপুর, বর্ধমান ও হাওড়া, এই ৩টি শেডের অ্যালকো গুলিকে বিপুল ভাবে পণ্যবাহী ট্রেনের দায়িত্ব দেওয়া শুরু করে! জামালপুর ও হাওড়া শেডের যাত্রীবাহী ট্রেনের প্রয়োজন মতো কিছু বরাদ্দ রেখে বাদবাকি প্রায় সব অ্যালকো গুলিকে (হাওড়ার

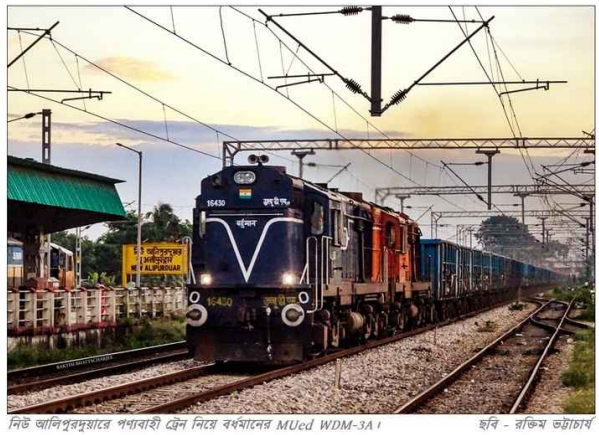

*নিউ আলিপুরদুয়ারে পণ্যবাহী ট্রেন নিয়ে বর্ধমানের MUed WDM-3A।* *ছবি - রক্তিম ভট্টাচার্য*

WDM-3D, WDM-3A ও জামালপুরের WDM-3A) গুলিকে পণ্যবাহী ডিউটিতে পাঠানো শুরু করা হয়।

পণ্যবাহী ডিউটিতে অ্যালকো দেওয়ার আলোচনায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে বর্ধমান ডিজেল শেডের ভূমিকা। আমরা জানি যে বর্ধমান একটি সম্পূর্ণ ভাবে অ্যালকো লোকো হোল্ডিং শেড ছিল এবং বরাবরই যাত্রীবাহী ট্রেনের ডিউটির ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের প্রায় ৯০% লোকোই ব্যবহার হতো যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য। কিন্তু যাত্রীবাহী ট্রেনের ডিউটি কমতে থাকায় অ্যালকো গুলিকে MUed (মাল্টিপল ইউনিট) করিয়ে পণ্যবাহী ডিউটিতে পাঠানো শুরু করা হয়। বর্ধমানের অ্যালকো উত্তর-পূর্বগামী পণ্যবাহী ট্রেনের দায়িত্ব পেতেও শুরু করে। ২০২১ এর শুরুর দিকে যখন বর্ধমানের হাত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে যাত্রীবাহী ট্রেনের নিয়মিত ডিউটি চলে গেল, ততদিনে প্রচুর লোকো, MUed রূপে, নিয়মিত পণ্যবাহী ডিউটি পেতে শুরু করে দিয়েছে। কিছু লোকো অবশ্য হাওড়া ডিভিশনের শান্টিংএর কাজেও লাগানো হয়। ২০২১ এ এরকম সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কারণ প্রধানত পূর্ব রেল প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে বৈদ্যুতিন জোন, তাই বর্ধমানকে মূল ডিউটির জন্য নিজের লোকো অন্য জোন অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে পাঠাতে হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত বর্ধমানের হোল্ডিংএ সমস্ত লোকোই WDM-3A যা ভারতীয় রেলের বর্তমান অ্যালকো লোকোর মধ্যে সবচেয়ে বরিষ্ঠ শ্রেণী হওয়ার কারণে, অন্যান্য জোনে তাদের কর্মজীবনের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। তৃতীয় কারণ - বর্ধমান ডিজেল শেডে আগেই বৈদ্যুতিক লোকো WAG-9 দেওয়া হয়েছিল। এবার ভারতীয় রেল যে যে ডিজেল শেডকে বৈদ্যুতিক লোকো দিয়েছিল তারা প্রত্যেকে নিজের ডিজেল, প্রধানত অ্যালকো

*পণ্যবাহী ট্রেন নিয়ে জামালপুর WDM-3A ১৬৬০৮* *ছবি - রক্তিম ভট্টাচার্য*

*বোলপুরে পণ্যবাহী ট্রেন নিয়ে বর্ধমানের MUed WDM3A।* *ছবি - অনমিত্র বোস*

*পণ্যবাহী ট্রেনের দায়িত্বে হাওড়া WDM3A* *ছবি - সোমশুভ্র দাস*

ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছিল। বর্ধমান বৈদ্যুতিক লোকো রাখার পরেও যে ভাবে WDM-3A লোকোগুলিকে ফেলে না রেখে সঠিক ব্যবহার করছিল তা রীতিমত প্রশংসনীয়।

বর্ধমানের মতো হাওড়া এবং জামালপুর ডিজেল শেডও কিন্তু একই ভাবে নিজেদের অ্যালকো গুলিকে পণ্যবাহী ডিউটিতে দেওয়া শুরু করে। হাওড়া নিজের WDM-3D ও WDM-3A মাল্টিপল ইউনিট করিয়ে এবং জামালপুর মূলত নিজের WDM-3A সিঙ্গেল ইউনিট করিয়েই পণ্যবাহী ট্রেনের দায়িত্বে দেওয়া শুরু করে। শিয়ালদহ ডিভিশনের রানাঘাট এবং বর্ধমান থেকে সাহেবগঞ্জ লুপগামী পণ্যবাহী ট্রেনগুলিকে হাওড়া শেড, এবং জামালপুর মূলত মালদা ডিভিশনের পণ্যবাহী ট্রেনগুলিতে অ্যালকো লিঙ্ক দিতে শুরু করে।

অণ্ডাল ডিজেল শেড নিজের লোকো আগের মতনই সাহেবগঞ্জ লুপ, আসানসোল ডিভিশনের বিস্তীর্ণ এলাকা ও হাওড়া ডিভিশনের কিছু জায়গায় পণ্যবাহী ট্রেনে ডিউটি করাতে লাগলো।

অতএব, দেখা গেল যে, পূর্ব রেল নিজের সমস্ত কর্মক্ষম লোকোই সঠিক কাজে ব্যবহার করে যাচ্ছিল। একমাত্র ১৪*** সিরিজের WDM-3A নন-রিবিল্ট (এই লোকো গুলি সার্ভিস লাইফের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় এসে গেছে তাই এদের পুনর্নির্মাণ দরকার কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় রেল অ্যালকো লোকোর ওপর কোনরকম বড়সড় কাজ করাতে আগ্রহী নয় তাই এদের পুনর্নির্মাণ হয়েনি এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে) লোকো ছাড়া আর সমস্ত লোকোই মেইনলাইন ডিউটিতে ছিল। অন্যান্য জোনে যেমন দেখা যায় কর্মক্ষম অ্যালকো লোকো নিজের ডিউটি হারিয়ে শেডে পড়ে আছে, সেখানে পূর্ব রেলের কোনই ডিজেল শেডেই এরকম লোকো পড়ে ছিল না বললেই চলে।

*ছবি - সোমশুভ্র দাস*

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও হলো যে বর্ধমান/হাওড়া/জামালপুরের লোকো পণ্যবাহী ডিউটিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল থেকে অন্যান্য জোন যেমন পূর্ব-মধ্য রেল, উত্তর রেল ও উত্তর-পশ্চিম রেলেও যেতে লাগল। পূর্ব রেল থেকে, আগে শুধুমাত্র অণ্ডালের লোকো দেখা যেত সমগ্র ভারতীয় রেল জুড়ে পণ্যবাহী ট্রেনের ডিউটিতে, সেখানে এখন বর্ধমানের লোকোও বিপুল ভাবে দেখা যেতে লাগল। বহু জায়গার রেলপ্রেমীরা বর্ধমানের WDM-3A দেখতে পেতে লাগল এবং রেলপ্রেমী সংগঠনের মধ্যে এক সাড়া যোগানো ব্যাপার হয়ে উঠল বর্ধমানের লোকো। পাশাপাশি হাওড়া ও জামালপুরের লোকোগুলিও বহু জায়গায় দেখা দিতে লাগল পণ্যবাহী ট্রেনের ডিউটিতে। একটি ক্ষেত্রে তো এমনও হয় জামালপুরের WDM-3A সুদূর দক্ষিণ-মধ্য রেলে পৌঁছে যায় অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেন নিয়ে। উত্তর-পশ্চিম রেল তথা রাজস্থানের মতো সুদূর জায়গাতেও রেলপ্রেমীরা বর্ধমানের লোকো দেখতে পেল একাধিক বার এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা বেশ এক আলোচ্য বিষয় হয় উঠল। এমন কি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলেও আগে পণ্যবাহী ট্রেন নিয়ে পূর্ব রেলের অ্যালকো লোকো দেখা যেত না যতটা এখন দেখা যেতে লাগল। কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ধমানের লোকো অন্য জোনের যাত্রীবাহী ট্রেনেও ডিউটি করেছে এমনকি সেই জোনের রাজধানী এক্সপ্রেস পর্যন্ত টেনেছে।

আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, যে পূর্ব রেল আলাদা করে নিজের জোনের মধ্যের পণ্যবাহী ট্রেনগুলোকে অন্য জোনের ডিজেল লিঙ্ক খুলে নিজের অ্যালকো দিতে লাগল যাতে নিজস্ব লোকোর ডিউটি বাড়ে। এটা মনে হওয়ার কারণ এমন অনেক পণ্যবাহী ট্রেন দেখা যেতে লাগল যা হয়তো খবর অনুযায়ী বাইরের কোন ডিজেল শেডের লোকো নিয়ে আসছিল তার থেকে সেই লোকোটি খুলে পূর্ব রেলের অ্যালকো লোকো দেওয়া হলো! এটা হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো করে একটা অত্যন্ত সাধারণ পরিসংখ্যান - একটা জোনের নিজস্ব লোকোর যত ডিউটি বাড়ে ততো সেই জোনের তথা ভারতীয় রেলের টাকা বেশি আয় হয়। তাই হয়ত পূর্ব রেল নিজের লাভের কারণে নিজের অ্যালকো লোকোর ডিউটির জন্য এরকম পদ্ধতি অবলম্বন করছে। হয়ত এতে অন্যান্য জোনের লোকোর ডিউটি কমছে, কিন্তু বর্তমানে যা পরিস্থিতি, এরকম করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই; রেল জোনগুলিকে একে অপরকে সরিয়েই এখন নিজেদের ডিজেল লোকোর ডিউটি তুলতে হবে যা একপ্রকার ডারউইনের 'সারভাইভাল অফ দা ফিটেস্ট' বা যোগ্যতমের বেঁচে থাকার মতন।

পূর্ব রেলের মতাদর্শ হয়তো কিছুটা এমন - তাড়া চায় যে কোন সক্ষম লোকোমোটীভ শেডে বসে না থেকে অর্থ অর্জন করুক। তাই হয়ত তাড়া স্বাভাবিক যাত্রীবাহী ট্রেনের ডিউটি চলে যাওয়াতে পণ্যবাহী ট্রেনের দিকে ঝুঁকেছে। যাত্রীবাহী ট্রেনের যেমন নির্দিষ্ট নিয়ম আছে বৈদ্যুতিক তো বৈদ্যুতিকই আর ডিজেল তো ডিজেল লোকোই দিতে হবে, পণ্যবাহী ট্রেনে সেরকম কোন কড়া নিয়ম নেই। দরকার মতো পণ্যবাহী ট্রেনে ডিজেল এবং বৈদ্যুতিক দুরকম লোকোই দেওয়া যেতে পারে। তাই জন্য পণ্যবাহী ট্রেনে লোকো দিয়ে জোনগুলির নিজস্ব লোকোর ডিউটি বৃদ্ধি করানোর সবচেয়ে সহজ এক উপায়।

ভারতীয় রেলের প্রতিটি লোকোই একেকটি অ্যাসেট বা সম্পত্তির মতন- এগুলি বিপুল অঙ্কের টাকা খরচা করে বানানো হয় এবং লোকোগুলি থেকে ডিউটির মাধ্যমে টাকা আয় হয় রেলের। তাই পূর্ব রেল সহ অনান্য জোন সচল লোকো গুলি বসিয়ে না রেখে পুনর্ব্যবহারের চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য এক সিদ্ধান্ত।

সাধারণত বৈদ্যুতিক লোকোর গতিবেগ এবং অশ্বশক্তি বেশি হলেও ডিজেল লোকোর haulage power বা ভার বহন ক্ষমতা তাদের অশ্বশক্তির তুলনায় অনেকটাই বেশি। ভারতীয় রেলের পরিস্থিতিতে, ডিজেল লোকোর ব্যবহার দেখা গেছে কোনও প্রকারেই বৈদ্যুতিক লোকোর কর্মক্ষমতার থেকে কম না বরঞ্চ তার চেয়ে কিছুটা বেশি কোনো কোনও পরিস্থিতিতে। এই কারনেই বৈদ্যুতিকরণ এবং এত বৈদ্যুতিক লোকো হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক জায়গাতেই ভারতীয় রেল এখনও ডিজেল লোকো চালাচ্ছে।

অ্যালকোর যথাযোগ্য ব্যবহারকারি যে অন্য দুটি জোনের কথা আমরা দেখেছিলাম, সেই পূর্ব তট রেল এবং দক্ষিণ-মধ্য রেল ও কিন্তু নিজেদের WDM-3A লোকো চালানো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে হয়ত একটা যুক্তি আসতে পারে যে এই লোকোগুলি বয়স্ক

এবং অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম তাই এদের বসিয়ে দেওয়া যুক্তিসম্মত। কিন্তু পরিসংখ্যান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে WDM-3A লোকো গুলি বর্তমান ভারতীয় রেলের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট সক্ষম। এদের কর্মক্ষমতাও কিন্তু সেই কথাই বলছে। এবং অনেক WDM-3Aর ই এখনও বেশ কিছুটা কর্মজীবন বাকি আছে। সুতরাং এই লোকোগুলির কর্মক্ষমতার শেষ অবধি ব্যবহার করাটা, বিশেষত যেখানে এরা রেলের হয়ে ভালো পরিমাণের টাকা আয় করতে পারে, যথেষ্টভাবে যুক্তিসম্মত। ক্ষমতার কথা উঠলে এমনও করা যায়, এখন যেহেতু অ্যালকোর ডিউটি কমছে তাই এগুলি সব জোড়া করে মাল্টিপল ইউনিট (MUed) রূপে চালালে হয়তো ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে না এবং কম ডিউটিতেই বেশি লোকো ব্যবহার করা যাবে।

পূর্ব রেলের আরও একটি ছোট্ট প্রশংসনীয় জিনিস নজরে এসেছে সেটা হলো তারা এমন অ্যালকো লোকো দিয়েও ডিউটি করাচ্ছে যেগুলো ডিজেল লোকো ওয়ার্কসে গিয়েছিল বৈদ্যুতিক লোকোতে রূপান্তরিত হবার জন্য। ভারতীয় রেল একটা প্রকল্প এনেছিল ডিজেল লোকো রূপান্তরিত করে বৈদ্যুতিক লোকো করার, যার বিভিন্ন শেড থেকে WDG-3A (অ-পুনর্নির্মিত) নেওয়া হয়েছিল। পূর্ব রেলের অঞ্চলের থেকেও কিছু WDG-3A নেওয়া হয় এই প্রকল্পের জন্য। কিন্তু এই প্রকল্পটিতে নানা রকম সমস্যা হওয়ার কারণে এটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যারপর এই নিয়ে রাখা WDG-3A গুলিকে একে একে সব শেডে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ শেডই কিন্তু এই লোকো গুলি ফিরিয়ে এনে না চালিয়ে বসিয়ে দেয়। একে অ্যালকোর চাহিদা কম তায় এই লোকোগুলি বহুদিন বসে থাকার ফলে অক্ষম হয়ে পরা - এই দুইই ছিল প্রধান কারণ। অঞ্চল কিন্তু নিজের এই লোকোগুলিকে ফিরিয়ে আনে এবং মেরামত করে আবার মেইনলাইন সার্ভিসে ফিরিয়ে দেয়। এই আপাত ছোট্ট পদক্ষেপটিও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ - এটা পূর্ব রেলের অ্যালকো ব্যবহারের মনোভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দেয়।

পূর্ব রেলের WDM-3A গুলির সার্ভিস লাইফ শেষের দিকে - এদের ৩০ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর একে একে সার্ভিস থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ততদিনে হয়ত ভারতীয় রেলের ডিজেল লোকোর প্রতি মনভাবটা আরও নেতিবাচক হয়ে যাবে। তবে পূর্ব রেলের অ্যালকোর ব্যবহার আমাদের একটি ক্ষীণ ইতিবাচক আলো দেখাচ্ছে। যেভাবে এখনও এই ২০২৩ সালে এসেও পূর্ব রেল নিজের অ্যালকোকে ব্যবহার করছে, তাতে আশা করা যায় আরও কিছুদিন তাড়া কর্মক্ষম লোকোগুলিকে ভালো ভাবেই চালাবে। যে সকল রেল জোন যেমন দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও পশ্চিম-মধ্য রেল যারা নিজেদের অ্যালকো লোকো ব্যবহার একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে এবং বিপুল সংখ্যক যথেষ্ট নতুন লোকো যেমন WDM-3D, WDG-3A বসিয়ে দিয়েছে, তারা পূর্ব রেলকে এই লোকোগুলি হস্তান্তর করে দিলে ওগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার হতে পারে। পূর্ব রেলের বর্তমান WDM-3A গুলির কর্মজীবন শেষ হলে, ওই WDG-3A গুলি দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে পণ্যবাহী ডিউটি করানো যেত। আর আগেই আমরা দেখেছি ভারতীয় রেলের প্রতিটি লোকো একেকটি সম্পত্তির

*এই লোকোটি পুনর্নির্মাণের জন্য দেওয়া হলেও পরে ফিরিয়ে আনা হয় ও অঞ্চল শেড এটিকে মেরামত করে ডিউটিতে নামিয়ে দেয়। ছবি - রক্তিম ভট্টাচার্য*

*বিদায়... ভারতের মাটিতে শেষবারের মত গরিমাময় উপস্থিতি। বাংলাদেশে পাড়ি দেবার আগে রানাঘাটে সমগ্র রেলপ্রেমীদের ক্যামেরায় চিরতরে লেন্সবন্দি হয়ে থেকে যাবে এই অ্যালকোগুলি। ছবি - সোমশুভ্র দাস*

সার্ভিসে ফিরিয়ে আনা যেত, তাহলে হয়তো শেষ অবধি রেলের লাভই হত।

বর্তমানে ভারতীয় রেল খুব দ্রুতগতিতে ১০০% বৈদ্যুতিকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অ্যালকো লোকোমোটিভ নিয়ে কোনরকম ইতিবাচক আলোচনা করা যথেষ্টই কঠিন - যার কারণ হয়ত পাঠকের এতক্ষণে বোঝা হয়ে গেছে। পূর্ব রেলের মতো জোনেও কিছু পরিমাণ অক্ষম WDM-3A, যেগুলি বসিয়ে দেওয়া হয়ছিলো (সব কটিই নিজের কর্মজীবনের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া), সেগুলিকে ডিউটি থেকে সরিয়ে বাতিল বা স্ক্র্যাপ করাও হয়েছে। ধীরে ধীরে হয়ত এমনও হবে যে পূর্ব রেল আরো প্রচুর অ্যালকো লোকো ডিউটি থেকে সরিয়ে স্ক্র্যাপ করতে বাধ্য হবে। এবং একদিন হয়তো সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ব রেল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে অ্যালকো লোকো কিন্তু ততদিনে ভারতীয় রেলের রূপকথায় পূর্ব রেলের অ্যালকো এক বিশেষ স্থান অর্জন করে নেবে। কিন্তু, এত কিছুর মধ্যে কিছু ভালো ব্যাপারও ঘটেছে যেটা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়; যেমন, বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জোনের কার্যক্ষম এবং অপেক্ষাকৃত নতুন অ্যালকোগুলি (মূলতঃ WDM3D ও WDG3A) ভারতের বিভিন্ন বেসরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থাগুলি কিনে বা লিসে নিয়ে নিজেদের ইয়ার্ডে শান্টিংএর কাজে লাগাচ্ছে। এছাড়াও বেশ কিছু অনুরূপ অ্যালকো লোকো বাংলাদেশ রেলকে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়াও চলছে। আশা করাই যায় যে আগামী বহুবছর ধরে সেগুলি স্বমহিমায় পরিষেবা দিয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের অনান্য জায়গায় যেমন অ্যালকো লোকোর শেষ দিন গুলি বড়ই কঠিন ও নির্মম, পূর্ব রেলের অ্যালকো গুলির শেষ জীবন কাটছে বিপুল পরিমাণে পণ্য পরিবহণ করে। চলে যাওয়ার পরেও রেলপ্রেমীদের হৃদয়ে অ্যালকোর জন্য থেকে যাবে এক বিশেষ জায়গা। হয়ত পুরোপুরি মুছে ফেলা যাবে না অ্যালকো লোকোকে - ৫০ বছরেরও দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী এই লোকোগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেকের অনেক আবেগ, অনেক ভালবাসা, তা সাধারণ মানুষের মনেও যেমন, রেলকর্মীদের মনেও হয়তো ঠিক তেমনি। ঠিক যেন স্টিম ইঞ্জিনের মতো এই অ্যালকোও স্থান করে নেবে ছোটদের গল্প-কবিতায়, ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে থাকবে লোকের জীবনের সঙ্গে।

আর লেখকের মনে থেকে যাবে ছোটবেলার সেই সাহেবগঞ্জ লুপের প্রান্তিক রেল স্টেশনের দৃশ্য- সেই খয়েরী রঙের লোকো, সেই চিরচারিত "ঘট-ঘট-ঘট-ঘট" আওয়াজ...

*প্রবন্ধে আলোচিত সমস্ত মতামত ও ব্যাখ্যা লেখকের নিজের এবং তা কোনো ভাবেই রেল ক্যানভাস টিমের মতামত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।*

*প্রচ্ছদ চিত্র সংকলন - টিম ট্রেনট্র্যাকার্স এর সৌজন্যে।*

# আরাবল্লির বুকে...

সোমশুভ্র দাস

'রাজস্থান মে ডাকু হ্যায়?' মনে পড়ে আপনাদের সেই ঐতিহাসিক সংলাপ? চলচ্চিত্রের নাম, পরিচালক বা অভিনেতাদের সাথে নিশ্চয়ই নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। চার দশক অতিক্রান্ত – তবুও বাংলা, বাঙালি ও সত্যজিৎ রায়ের সোনার কেল্লা যেন একে অপরের পরিচায়ক। তাই জটায়ুর ভাষায় আমার এই 'সাম্প্রতিকতম' নিবেদনটি রাজস্থানের 'পট্-ভূমিকায়', রাজপুতানার একমাত্র অবশিষ্ট মিটার গেজ ট্রেন নিয়ে অর্থাৎ মারয়াড়-মাভলী ছোট রেল। এক সময়ে উত্তর-পশ্চিম রেলের অন্তর্গত অধিকাংশ লাইনই ছিল মিটার গেজের আওতায় যা 'Mission Unigauge'-এর কোপে আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারির দুপুর, রোদের তেজ বেশ কম, শীতের শেষ বেলার পড়ন্ত রোদ – তবে বেশ উপভোগ্য, এমনই একটা সময়ে আমার ট্রেন পৌঁছে গেল মারয়াড়। নেমে পড়লাম ট্রেন থেকে। উদ্দেশ্য, পরের দিন আরাবল্লীর বুক চিরে পাতা ছোট লাইনের ট্রেনযাত্রা উপভোগ করা। যদিও নেমে যা পরিস্থিতি দেখলাম তাতে ইচ্ছেপূরণের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেল। লাইন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুপুরের নির্ধারিত ট্রেন তখনও ছাড়েনি – চলছে লাইন মেরামতির কাজ। মনে তখন আশঙ্কার মেঘ ঘনাচ্ছে – আদৌ ছোট ট্রেন চলবে তো! উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে এগিয়ে গেলাম হালচাল জানতে। কিছুটা আশ্বস্ত হলাম কাজের গতিপ্রকৃতি দেখে। বিকেল পেরোতে না পেরোতে সমস্যার সমাধান মিলল, চলল ট্রেন। একটি নিকটবর্তী হোটেলে কোন মতে রাতটুকু কাটিয়ে কাক ভোরের অন্ধকারে পাড়ি দিলাম ছোট রেলের প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যে। ইএমডি আর এ্যালকোর গর্জনের দাপটে তখনও চতুর্দিক ত্রস্ত, তারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একের পর এক দ্বিতল পণ্যবাহি ট্রেন যাদের রেলের পরিভাষায় বলে 'ডাবল স্ট্যাক'। ভোরের আলো না ফুটলেও প্ল্যাটফর্মের বিজলি বাতির আলো বেশ জোরালো। চড়ে বসলাম একটি কামরায়। কনকনে শীত আর নির্জন কোচে যাত্রা যেন লালমোহন বাবুর 'রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা'।

টিমটিমে আলো সঙ্গী করে যাত্রা শুরু হল। জ্বলল সবুজ বাতি, বাজল হুইশেল, শুরু হল পথ চলা চাঁদনি রাতকে সাক্ষী করে। রাতই বটে কারণ দেশের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য্যিমামার ঘুম বেশ দেরীতেই ভাঙে। ২৫ কি. মি. টানা পথ অতিক্রম করে, সমগ্র ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে, ট্রেন পৌঁছোয় ফুলাডে। এখানে বদলাবে ট্রেনের গতিপথ। ইঞ্জিন এবারে লাগবে উল্টোদিকে, মানে 'রেক রিভার্সাল'। জন-মানবহীণ স্টেশন এই ফুলাড। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা এই জায়গায় কিভাবে ইঞ্জিন লাগবে তা যথেষ্ট 'cultivate করার বিষয়'। কিন্তু এই কাজ অবলীলাক্রমে প্রতিনিয়ত হয়ে এসেছে, আজও তাই হল। মিনিট কুড়ি বাদে, হিমেল হাওয়ার গতির সাথে পা মিলিয়ে উল্টো পথে ছুটলো ট্রেন। মাঝে মধ্যেই মনে হচ্ছে কিছু ছায়াবস্তু সরে সরে যাচ্ছে, মন্দার বোসের ভাষায় 'দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর আমি একা'। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম আমার পাশের কামরায় বিশেষ আলো নেই। আমার কোচেও সবকটা আলো জ্বলছে না, কোনো কোনো বাতি খারাপ আবার কোথাও বাল্বই উধাও। এই আবছা আলোআঁধারি পরিবেশ মনে করিয়ে দিল জটায়ুর সেই চিরস্মরণীয় সংলাপ 'Dacoits, one of the innumerable dacoits in this dacoit infested country....'। নিজের সম্পূর্ন ফাঁকা কোচের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দর্শন পেলাম সহযাত্রীর – কামরার অপর প্রান্তে। পড়নে ধুতি আর আগাগোড়া কালো শালে মোড়া চেহারা, যা দেখে লালমোহন বাবু নির্ঘাত বলে উঠতেন 'highly suspicious'। কিছুটা আশঙ্কায় ছিলাম

কারণ আরাবল্লীর 'dacoit' না হলেও কোনো ছিনতাইকারির কবলে পড়লে নিজের পরিরক্ষণের জন্য জটায়ুর মতো 'নেপাল কা অস্ত্র' নেই আমার কাছে, না আছে ফেলু মিত্তিরের মগজাস্ত্র বা Colt .32, আছে কেবল অসহায়তা। তাই কিছুটা ভয়ভীত হয়েই অপেক্ষায় রইলাম দিনের আলোর। মনে হল আমার চারপাশে যা যা ঘটছে তা যেন 'সোনার কেল্লা'-র নানান দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। মানিকবাবুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বড় পর্দায় তার যথার্থ রূপায়ণ তাঁর দক্ষতার পরিচায়ক। তাই পরিচালকের এই অনবদ্য সৃষ্টিকে কুর্নিশ জানাই। তিনি যেন আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

অন্ধকার কাটিয়ে ধীরে ধীরে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে পড়ছে নীল আকাশের বুকে। ইতিমধ্যেই ট্রেনের চড়াই শুরু হয়ে গেছে। কাঁটাঝোপের রাজত্ব পেরিয়ে আমরা ক্রমশই পাহাড়ের কোল থেকে চটির পথে অগ্রসর হচ্ছি। রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে সবুজের ছোঁয়া যেন মরুভূমিতে প্রাণের স্পর্শ। পাহাড়ের গা কেটে, জগদ্দল পাথর সরিয়ে পাতা হয়েছিল রেলপথ যা চলেছে ছোট বড় সুড়ঙ্গ আর উঁচু উঁচু ভায়াডাক্ট বেয়ে। সুড়ঙ্গের মাথায় খোদাই করা রয়েছে নির্মাণবর্ষ যে দেখে চমকে যেতে পারেন – ১৯৩৪! এটা ভেবে সত্যিই অবাক লাগে যে কি কৌশলে ওই সময়ে এমন দুর্গম ভূখণ্ডে এই অসাধ্য সাধন করা হয়েছিল। সত্যিই এ যেন এক 'Engineering marvel'। রুক্ষ শুষ্ক স্তূপাকার পাথুরে পথ চলতে চলতে মাঝে মধ্যেই হাতছানি দিচ্ছে সবুজ – যেন মরুভূমির মাঝে এক ছটাক্ মরুদ্যান। এমনই অপরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে কোন এক পাহাড়ের কোণ থেকে উঁকি দিল সূর্য। হাওয়ায় তখনও শীতের ছোঁয়া। আরাবল্লীর রূপের বাহার সূর্যের আলোয় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সব দেখে মনে হচ্ছে যেন ভিন্ন কোন জগতে, অন্য কোন সময়েকালের মধ্যে এক কাল্পনিক যাত্রার সাক্ষী হয়ে রইলাম। আরাবল্লীর পরতে পরতে রয়েছে বিস্ময়কর সৌন্দর্য। এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় - কু ঝিক্ ঝিক্ করে দুলে দুলে চলেছে আমাদের খেলনাগাড়ি ট্রেন, হ্যাঁ খেলনাগাড়িই বটে তবে তা হিমালয়ের বক্ষে দৌড়ানো কাঙ্গরা ভ্যালি রেল বা কালকা-শিমলা রেলের চেয়ে কোনো অংশে কম রোমাঞ্চকর নয়।

চলতে চলতে ট্রেন এসে পৌঁছোয় গোরাম ঘাট স্টেশনে। সে যেন স্টেশন নয়, প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যকল্প উপভোগ করার এক চমকপ্রদ ঠিকানা। এক দিকে গভীর খাদ আর ওপর দিকে পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে প্ল্যাটফর্ম। যেদিকে নজর যায় সেদিকে শুধুই জনমানবহীন পাহাড়। ট্রেন আবার যাত্রা শুরু করল সামান্য বিরতির পর। নির্জন পাহাড়ে আমাদের ট্রেনের সাথী কেবল তারই প্রতিধ্বনি। ভোরের রোদ মাখা আরাবল্লীর রূপ অভিভূত করবেই আপনাকে। প্রকৃতি এখানে কিছুটা নির্মম হলেও সেই নির্মমতাও যেন প্রকৃতির এক ভিন্ন রূপের প্রকাশ। শুধু রূপের গুণগান করলে ভুল হবে, এই সমগ্র বিস্তীর্ণ পাহাড়ি অঞ্চলই সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত, বিশুদ্ধ বাতাসে প্রাণ ভরা নিশ্বাস আপনাকে পুনরুজ্জীবিত করবে। অগুন্তি বাঁক পেরিয়ে, দুর্গম আরাবল্লীর বুক চিরে অবশেষে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছল খাম্বলী ঘাট স্টেশনে। স্টেশন সংলগ্ন একটি সাইন বোর্ডে লেখা 'End of Ghats' অর্থাৎ পাহাড়ি অঞ্চলের সমাপ্তি। সাথে রয়েছে সতর্কবাণী 'ফটোগ্রাফি নিষিদ্ধ' যার প্রকৃত কারণ ঠিক বোধগম্য হল না কারণ প্রকৃতির এই অপরূপ

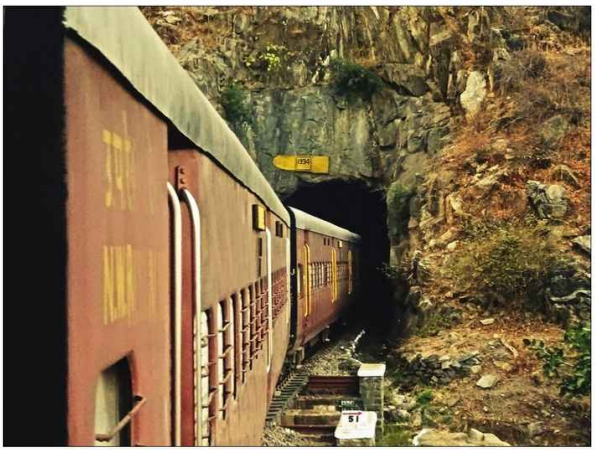

শোভা ক্যামেরাবন্দি করতে না দেওয়ার কি যুক্তি রয়েছে তা কেবল কর্তৃপক্ষই জানেন।

এর পরের যাত্রাপথের সঙ্গী ছিল উপত্যকার চড়াই উৎরাই, কিছু শুষ্ক নদ-নদী আর মরু অঞ্চলের গাছপালা যা ওই এলাকার জলকষ্ট ও কঠিন জীবনযাপনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকে না। বিরূপ পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়াই মানবজাতির বেঁচে থাকার 'সহজ' চাবিকাঠি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সহযাত্রীদের উজ্জ্বল বর্ণের পোষাক ও রঙিন পাগড়ী যেন এখানকার অধিবাসীদের বর্ণময় সাংস্কৃতির প্রতীক। তাই যাত্রাপথে এহেন সহযাত্রীদের উপস্থিতি সফরকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলে। এই রুটের আরেক উল্লেখযোগ্য রীতি হল গার্ডসাহেবরাই এখানে টিকিট বিক্রেতার দায়িত্বে থাকেন। বিবিধ স্টেশনের যাত্রী তাঁর কাছেই ভিড় জমান টিকিটের জন্য কারণ বেশিরভাগ স্টেশনেই টিকিট কাটার ব্যাবস্থা নেই, নেই কোনো কাউন্টার, তাই এই অদ্ভুত বন্দোবস্ত। ট্রেনে টিকিট পরীক্ষক না থাকলেও, বেশিরভাগ মানুষ টিকিট কেটেই যাত্রা করেন। দেখতে দেখতে নাথদ্বারা পেরিয়ে মাভলী চলে এলাম। হল ছোট রেলে যাত্রার অবসান। গাড়ি বদলে এবার ব্রড গেজে রওনা দিলাম প্রাক্তন মেবার রাজ্যের রাজধানী উদয়পুরের উদ্দেশ্য।

ছোট রেলের এই 'ট্রেনজার্নি' চিত্তাকর্ষক কিছু মুহূর্ত উপহার দিয়ে গেল যা আমার কাছে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে রইল। এতটাই মোহমুগ্ধ ছিলাম যে বিশ্বাই হচ্ছিল না আমার ছোট ট্রেন সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। পথে দেখা মিলেছে জটায়ুর 'আশ্চর্য জানোয়ার' তথা উঠ আর 'ন্যাশনাল বার্ড'-এর। সাথে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে রইলাম রেলের প্রাচীন এক রীতির, অর্থাৎ 'টোকেন এক্সচেঞ্জ'। চারভুজা রোড নামের স্টেশনে ফিরতি ট্রেনের সাথে সাক্ষাতের সময়ে হয় এই টোকেন এক্সচেঞ্জ – উল্টো দিক থেকে আসা ট্রেনের চালক 'টোকেন' হস্তান্তর করেন অপর ট্রেনের চালককে যার অর্থ হল সামনের রাস্তায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। স্থানীয় মানুষের বর্ণাঢ্য পোষাক, সাবেকি সেমাফোর সিগন্যালের সংকেতে পথচলা, ছোট্ট 'ওয়াই ডি এম ৪' ইঞ্জিনের পর্বতারোহণ আর আরাবল্লীর বিচিত্র রূপ – এই সবই যাত্রায় একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। মনের মণিকোঠায় চিরন্তনে জায়গা করে নিয়েছে এই অনন্য সফর। আজও মন চায় বারে বারে ফিরে যেতে ছোট রেলের দুনিয়ায়.... কিন্তু আর কত দিন? দেশের বাকি ছোট লাইনের মত এরও দিন গোনা শুরু হয় গেছে....মেয়াদ হয়ত হাতে গোনা আর মাত্র কয়েক মাস। তারপরে স্মৃতির পাতায় রয়ে যাবে চিরদিনের তরে....

*ব্যবহৃত সমস্ত চিত্র লেখক দ্বারা প্রেরিত এবং স্বত্বাধিকার দ্বারা সংরক্ষিত।*

# দুধসাগরের তীরে...

শ্রেয়া চক্রবর্তী

ঢাকের বাজনা থামিয়ে আলোক শয্যা কাটিয়ে যখন মা মর্ত থেকে স্বর্গে পারি দেন, বাঙালীর মনে রয়ে যায় শুধু পুজোর স্মৃতি, বেদনা ও আগামী বছরে মায়ের ফেরার নতুন করে প্রত্যাশা,আশা ও আকাঙ্খা। তবে মনের কোনায় কোথায় যেন যেন ছুটি ছুটি ভাবটা অবস্থান করে। তখন বাঙালীর বেদনাকাতর হৃদয় স্পর্শ করে যায়, ভারতবর্ষের নানা পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র। তাই বোধ করি, শতকরা আশি ভাগ বাঙালী, জুলাই ও অগাস্ট মাস থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন প্রকৃতির সৃষ্টি সেই পর্বতমালা, কিংবা মনের আনন্দ জাগানো ঢেউয়ের মালা বা মনের গভীরতাকে উদ্যেলিত করা অরণ্য দেখতে। আমিও সেই প্রকৃতির টানকে সাড়া দিতে, পাড়ি দিয়েছিলাম ভারতের ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্য, কোঙ্কন অঞ্চলের 'গোয়া' ভ্রমনে। যদিও জনসংখ্যা হিসেব করলে এটি চতুর্থ ক্ষুদ্রতম, কিন্তু আয়তন বিচারে ক্ষুদ্রতম বলা যেতে পারে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মহারাষ্ট্রেও পা রেখেছিলাম সেবারই। ১৫ই অক্টোবর, রাত সাড়ে এগারোটায় ১৮০৪৭ হাওড়া ভাস্কো-দা-গামা অমরাবতি এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু করলাম ১৬শ শতকের, পর্তুগিজদের প্রথম অবতরনের স্থান গোয়ার উদ্যেশ্যে। সাড়ে এগারোটার গাড়ি ধরবো বলেই, সান্ধ্যভোজন সেরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। যথাসময়ে আমাদের ১৮০৪৭ আপ অমরাবতী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১৯ নং প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হল। আমরা আমাদের স্বপ্নের ভ্রমনের প্রথম পদক্ষেপ নিলাম এবং বাতানুকুল দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় জিনিসপত্র যথা জায়গায় রেখে গুছিয়ে বসা হলো। ট্রেনটির দায়িত্বে থাকা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন WAP4 আমাদের নিয়ে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত। রাত ১: ১০ এ এসে পৌঁছলাম খড়গপুর জংশন এ এবং স্বভাবতই খড়গপুর আসতেই বাঙালীর খাবার এবং চা জলের কথা মনে আসে। সঙ্গে যা এনেছিলাম তার মধ্যে থেকেই বিস্কুট এবং প্লাটফর্ম থেকে চা কিনে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাত্রা শুরু করলো আমাদের গাড়ি পরের গন্তব্য বালাসোরের উদ্যেশ্যে হাওড়া চেন্নাই মেইন লাইন ধরে। এরপর একে একে ভদ্রক, জাজপুর, কেওনঝাড় এবং আরও ছোট ছোট স্টেশন পেরিয়ে যখন কটক পৌঁছলাম তখন বাঙালীর চিরকালীন প্রিয় ভ্রমন স্থান ও তীর্থ শ্রী জগন্নাথ দেবের ধাম পুরীর কথা ভেবে শিরদাঁড়ায় একটা শিহরণ খেলে গেল। সমুদ্রের উত্তাল রূপ ও তার ঢেউ যেন আছড়ে পড়ে বাঙালীর হৃদয়ে। ভাবতে ভাবতেই দেখলাম উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর পেরিয়ে এসে পৌঁছেছি খুরদা রোড এ। সেখানে পুরীর রাস্তাকে বিদায় জানিয়ে জয় জগন্নাথ বলে যাত্রা শুরু হল ব্রহ্মপুরের উদ্দেশ্যে। সকাল সাড়ে আটটায় ঘুম ভেঙে দেখি ট্রেন ব্রহ্মপুর স্টেশনে। উড়িষ্যার গাঞ্জাম জেলায় অবস্থিত এই ছোট্ট শহরটিতে বিস্তৃত ইউনেস্কো দ্বারা ঘোষিত, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, চিল্কা হ্রদ□ ব্রহ্মপুর স্টেশনে যে দু-মিনিট আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়েছিল তাতে যেটুকু চোখের আঙিনায় বাঁধতে পেরেছি তা হল কবির ভাষায় যাকে বলে "আহা কি দেখিলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।" উদীয়মান সূর্যের আলোয় যখন চিল্কার জল চিকচিক করে উঠছিল এবং তার হাল্কা সোনালি রঙ আমাদের গোটা কামড়া ভিতর কে ভরিয়ে তুলছিল, আমাদের মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার এই বিখ্যাত হ্রদে রয়েছে মা কালীর একটি জাগ্রত ও লোকমুখে প্রচারিত এক মন্দির যার নাম 'কালীযায়ী'। একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত এই মন্দিরে সারাবছর প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। এছারাও চিংড়ির চাষ ও পরিযায়ী পাখির জন্য এই হ্রদটি বিখ্যা। একরাশ মুগ্ধতা মনে চেপে রেখে, সেবারের মত চিল্কাকে বিদায় জানালাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও ছোট ছোট স্টেশন পেরিয়ে আমাদের

# পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বুক চিরে ছুটে চলার কিছু মুহূর্ত

অমরাবতী এক্সপ্রেস ঢুকে পড়লো অমরাবতীর রাজ্য অর্থাৎ অন্ধ্র প্রদেশে। পূর্বঘাট পর্বতমালার মাথায় মেঘের আনাগোনা ও চারিদিকে সবুজের সমারোহ উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম পূর্বতট রেলের উপর দিয়ে। এরপর পলাশা, শ্রীকাকুলাম ও বিজয়নগরম পেরিয়ে, আমরা এসে পরলাম নৌ-সেনার শহর বিশাখাপাত্তনাম। এইখানেই এতক্ষণ যে ইঞ্জিন টি আমাদের যাত্রা সঙ্গী ছিল সেটি খুলে নেওয়া হল এবং ট্রেনের উল্টো মাথায় অন্য একটি ইঞ্জিন জোড়া হলো, যা আমাদের উল্টো পথে যাত্রা শুরু করালো। এই পদ্ধতিকে রেলের পরিভাষায় বলে, 'কুইক লোকো রিভারসাল'। এরপর সামালকোট স্টেশন পেরিয়ে রাজামুন্দ্রির কাছে এসে দেখা পেলাম বিখ্যাত গোদাবরী নদীর, যার উৎপত্তি মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ত্র্যম্বকে। রাজামুন্দ্রির কাছে এসে ভারতবর্ষের এই দক্ষিণ-পূর্ব বাহি নদীটি, বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে। ইতিহাসের পাতা ঘাটলে দেখা যাবে অনেক প্রাচীন সভ্যতার জন্ম হয়েছিল এই পবিত্র নদীর পারে, যাকে আমরা দক্ষিণের নর্মদাও বলে থাকি। এছাড়াও রাজামুন্দ্রি অন্ধ্র প্রদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। এরপর অন্ধ্র প্রদেশের গ্রামীন নৈস্বরগিক দৃশ্য দেখতে দেখতে এলুরু পার করে আমরা এসে পৌঁছলাম আরেক বড় শহর বিজয়ওয়ারা। পথেই আলো কমে এসে তখন প্রায় সন্ধ্যে নেমে এসেছে। এখানে আবার 'কুইক লোকো রিভারসাল' এর দ্বারা ট্রেনটি দিক পরিবর্তন করে যাত্রা শুরু করলো। রাতের অন্ধকারে সুবৃহৎ কৃষ্ণা নদী পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম গুন্তুর জংশনে। এখান থেকেই আলাদা হয় তেনালী যাওয়ার লাইন, নাল্লাপার যাওয়ার লাইন ও গুন্টাকাল যাওয়ার রাস্তা। আমরা শেষের রাস্তাতেই অগ্রসর হলাম। এরপর আরও কিছু ছোট ও মাঝারি স্টেশন পেরিয়ে, কাম্বামে এসে নৈশভোজন সারলাম। এরপর আস্তে আস্তে সারা কামড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু রইল বাতানুকুল যন্ত্রের ঝি ঝি আওয়াজ, চাকার ঝম ঝম ও কিছু মানুসের নাসিকা গর্জনের আওয়াজ। সব মিলিয়ে তৈরি করেছিল এক মায়াবি পরিবে। আমি ও আমার সহযাত্রী কিছু বন্ধু নিচু গলায় কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছিলাম ও কল্পনা করছিলাম পরের দিনের আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা প্রকৃতির এক আলাদা রূপ। এরকম করেই বিনিদ্র ভাবে কেটে গেলো রাতের কিছু ঘন্টা। এরপর ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আমরা এসে পৌঁছলাম গুন্টাকাল জংশন এ। এখানেই সেই অতি প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এল যেখানে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন যাত্রা শেষ করলো ও দুটি ডিজেল ইঞ্জিন আমাদের পরবর্তী যাত্রার দায়িত্ব নিলো। প্ল্যাটফর্মে নেমে ভোরের চা সহযোগে এগিয়ে গেলাম যেদিকে ইঞ্জিনটি লাগানো হচ্ছে সেদিকে। আমি যেহেতু প্রযুক্তিগত ব্যাপারে অজ্ঞ তাই আমাদের এই নতুন ভারবাহকের ছবি নিয়ে চলে এলাম নিজের কামরায়। পরে আমার রেলপ্রেমী বন্ধুর থেকে জেনেছিলাম যে সেদুটি ছিল গুটি শেডের ALCO ইঞ্জিন। আমরা যতক্ষণে গুন্টাকাল ছাড়লাম ততক্ষণে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে। চারিদিকের ভূপ্রকৃতি তখন অনেক পাল্টে গেছে। সবুজ গালিচার জায়গায় তখন জায়গা করে নিয়েছে ডেকান মালভূমির রুক্ষ পাথুরে জমি। দূরে ছোটোখাটো পর্বতমালা সকালের রোদে ঝকমক করছিলো। এরপর আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম কর্নাটক রাজ্যে। এই রাজ্যের যে প্রথম বড়ো স্টেশনে আমাদের ট্রেনটি থামল তা হলো বল্লাড়ী। এরপর হোতাপেট জংশন এ আমারা আমাদের প্রাতঃরাশ সারলাম। এরপর গদক পেরিয়ে আমরা অবশেষে সকাল ৯টা নাগাদ এসে পৌঁছলাম হুবলি জংশনে। হুবলি হলো একটি বড় রেল শহর যেখান থেকে মাইসোর, পুনে, মারগাওন ও ম্যাঙ্গালোর যাওয়ার রাস্তা আলাদা হয়েছে। এরপর আমরা কর্নাটকের নানা মালভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম ধাড়োয়াড় পেরিয়ে লোন্ডা জংশনের দিকে। লোন্ডা জংশনে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম সবচেয়ে প্রতীক্ষিত মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার জন্য। টিকিট কাটার প্রথম দিন থেকেই এই রেল লাইনে নৈসর্গিক দৃশ্য নিজের চোখে দেখার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করেছি। যেকোনো প্রকৃতি প্রেমী মানুষের মতই পশ্চিমঘাটের এই অপরূপ সৌন্দর্য বারবার আমায় আকৃষ্ট করেছে। লোন্ডা জংশনের পর থেকেই শুরু হলো সেই সুবিখ্যাত ব্রাগনজা ঘা। ক্যাসেল রক থেকে আমাদের ট্রেন চরাই উঠতে শুরু করলো। ইতি মধ্যেই আমাদের ট্রেন টিকে চড়াই পার করবার জন্য, পিছনে আরও দুটি ইঞ্জিনে যুক্ত করা হয়েছে। এদেরকে রেল এর পরিভাষায় banker ইঞ্জিন বলে। ধীরে ধীরে আমাদের ট্রেন পশ্চিম ঘাট পর্বত

মালার কোল ঘেঁষে যেতে লাগলো ও আমরা এক একটি অপরূপ দৃশ্যের সাক্ষী রইলাম। ঘন জঙ্গল ও পাশাপাশি পর্বত শ্রেণী যেন প্রতি মুহূর্তে হাত ছানি দিচ্ছে। ছাব্বিশ কিমির এই রেলপথটি ব্রিটিশ স্থাপত্য শৈলীর এক অনন্য নিদর্শন এবং পূর্বে এটি একটি মিটার গেজ লাইন ছিল। এই রেল পথের সৌন্দর্য উপভোগ করার আদর্শ সময় বর্ষাকাল। কারানজাল পেরিয়ে আমরা চললাম এই অমরাবতী যাত্রার মূল আকর্ষণ অর্থাৎ দুধ সাগর জলপ্রপাতের দিকে। দুধ সাগর জলপ্রপাত মান্ডভি নদীর দ্বারা সৃষ্ট এবং গোয়ার একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। যখন আমরা দুধ সাগর পেরোচ্ছি, তখন যেন মনে হচ্ছিল তরল রুপোর ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টির কাছে মানুষ ও তার অহংকার নিতান্তই ক্ষুদ্র। আমরা যেহেতু অক্টোবর মাসে গিয়েছিলাম তাই এর ব্যাপ্তি ছিল অনেকটাই কম। তাও আমরা যে দৃশ্যের সাক্ষী রইলাম, তা হলো মনোমুগ্ধকর ও প্রানের আরাম। এই রোমাঞ্চ ও মুগ্ধতার ঘোর কাটতে না কাটতেই, আমরা এসে পড়লাম সোনালিয়াম। তখন আমরা পুরোপুরি গোয়া রাজ্যে প্রবেশ করেছি। এর সাথেই শেষ হলো Braganza ঘাটের এই মুগ্ধতায় মোড়া অভিজ্ঞতা। ধীরে ধীরে মনের মধ্যে একটি মিশ্র অনুভুতি জাগছিলো কারণ একই ধারে রয়েছে গোয়ার মতো একটি জায়গাকে প্রত্যক্ষ করার উদ্দীপনা,অপর ধারে এত সুন্দর একটি ট্রেন যাত্রার শেষ লগ্নে এসে পৌঁছনো। লাগেজ বের করতে করতেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যদি কোনোদিন আবার গোয়ায় আসি, অবশ্যই অমরাবতী তেই আসবো। এতগুলি রাজ্য, তাদের মানুষ, ভূপ্রকৃতি ও আরো নানা গল্প নিয়ে নেমে পড়লাম মারগাঁও জংশনে। এভাবেই জীবনের অন্যতম একটি রেল যাত্রার অভিজ্ঞতা চিরকালের মতো মনে গেঁথে রইলো।

*সমস্ত ছবি সোমশুভ্র দাসের সৌজন্যে।*

# ভারতীয় রেলের বৈচিত্র্যময় বৈদ্যুতিক লোকো লিভারি

সকল ছবি TrainTrackers এর আর্কাইভ থেকে

# ভারতীয় রেলের বৈচিত্র্যময় বৈদ্যুতিক লোকো লিভারি

সকল ছবি TrainTrackers এর আর্কাইভ থেকে

# ভারতীয় রেলের বৈচিত্র্যময় বৈদ্যুতিক লোকো লিভারি

সকল ছবি TrainTrackers এর আর্কাইভ থেকে

# ভারতীয় রেলের বৈচিত্র্যময় বৈদ্যুতিক লোকো লিভারি

সকল ছবি TrainTrackers এর আর্কাইভ থেকে

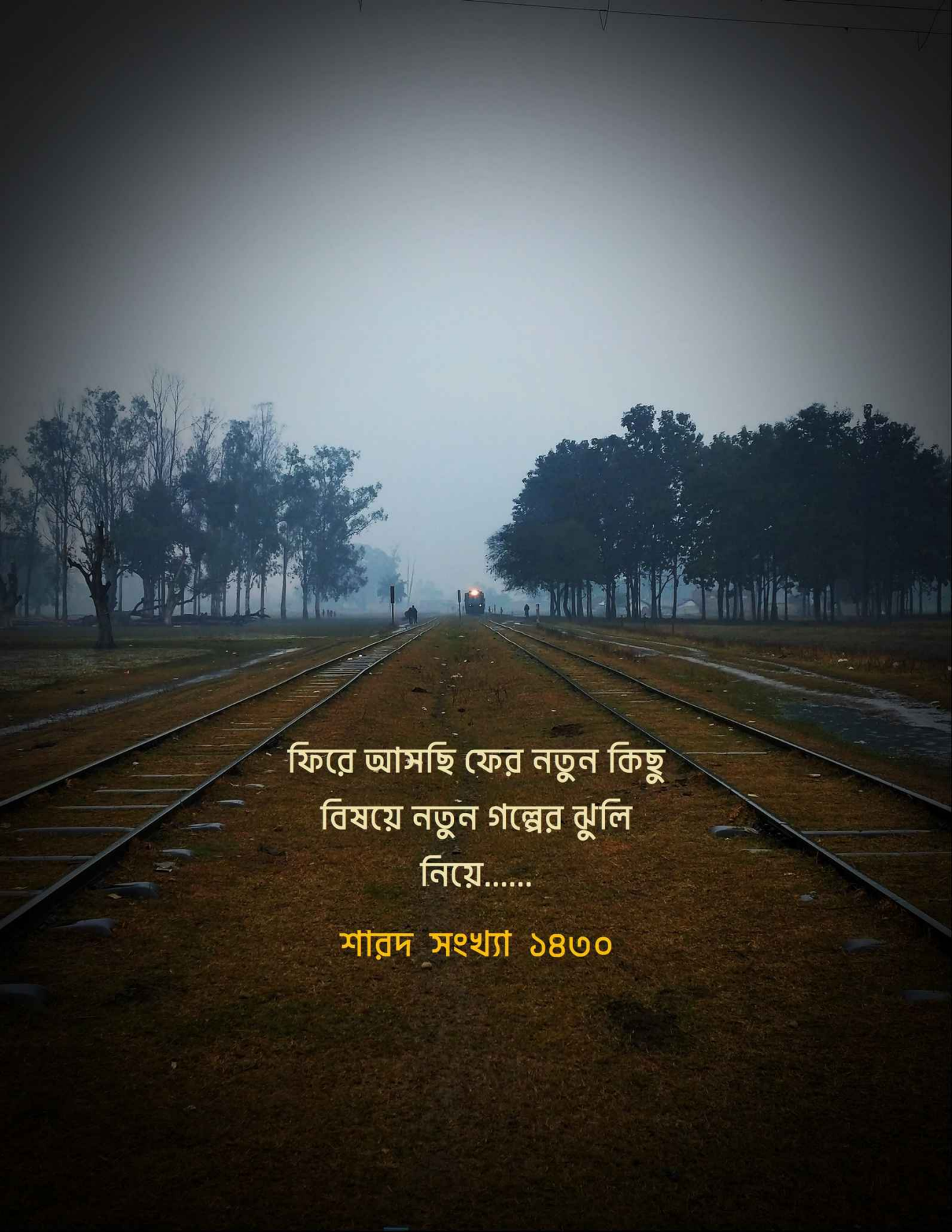
ফিরে আসছি ফের নতুন কিছু
বিষয়ে নতুন গল্পের ঝুলি
নিয়ে.....
শারদ সংখ্যা ১৪৩০